১। ভগবান লাভ করতে হলে সাধকের চাই :-
(১) ধৈর্য। (২) অধ্যাবসায়। (৩) দেহ ও মনের পবিত্রতা। (৪) তীব্র আকাঙ্খা বা ব্যাকুলতা। (৫) ষট্ সম্পৎ অর্থাৎ শম (অন্তঃকরণের স্থিরতা), দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), উপরতি (বিষয়ে আসক্তি-ত্যাগ), তিতিক্ষা (সকল প্রকার দুঃখে অবিচল থাকা), শ্রদ্ধা (গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস) ও সমাধান (ইষ্টে চিত্তস্থাপন)।

২। সাধন-ভজনের দ্বারা যে সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে তা গুরু ছাড়া আর কাকেও বলবে না। তোমার আধ্যাত্মিক সম্পদ – তোমার অন্তরতম চিন্তাধারা – নিজের অন্তরে লুকিয়ে রাখবে। তা অপরের কাছে প্রকাশ করবে না। উহা তোমার পবিত্র গুপ্তধন, একমাত্র ভগবানের সঙ্গে একান্তে উপভোগ্য বস্তু। সেই রকম তোমার দোষ, ত্রুটি ও অনাচেরের কথা অপরের কাছে বলে বেড়াবে না। তাতে আত্মসম্ভ্রম খোয়াবে, ও অপরের কাছে হীন বলে প্রতিপন্ন হবে। নিজের দোষ, দুর্বলতা ভগবানকে জানাবে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি সেগুলি শোধরাবার শক্তি দেন।

৩। ধ্যান করতে বসে প্রথমে খানিক্ষণ স্থির হয়ে বসে মন যেখানে যেতে চায় যেতে দাও। ভাববে, আমি সাক্ষী, দ্রষ্টা। বসে বসে মনের ভাসা-ডোবা, দৌড়ঝাঁপ দেখ, লক্ষ্য কর। ভাববে, আমি দেহ নই, ইন্দ্রিয় নই, আমি মন হতে সম্পূর্ণ পৃথক। মনও জড়, জড়েরই একটা সূক্ষ অবস্থা। আমি আত্মা, প্রভু মন আমার দাস। যখনই কোন বাজে চিন্তা মনে উঠবে, তখনই সেটাকে জোর করে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

৪। সাধারণতঃ বিশ্রামের সময় বাঁ নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ে, কাজের সময় ডান নাক দিয়ে পড়ে, ধ্যানের সময় দু'নাক দিয়ে পড়ে। যখন দেহ মন শান্ত হয়ে আসবে আর দু'নাক দিয়ে সমান ভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অনুকুল অবস্থা হয়েছে। তবে দেখবার জন্য নিঃশ্বাসের দিকে অত নজর দেবে না, অথবা এইটিকে মাপকাঠি করে কর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে না।

৫। মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয় - কুম্ভক হয়। আবার বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়। ভক্তিতেও কুম্ভক আপনি হয় – বায়ু স্থির হয়ে যায়। হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত স্মরণ-মনন ও মন্ত্রজপ করলে প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়।

৬। অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছাড়া মনের একাগ্রতা আনবার কোন অন্য কোন সুগম বা সহজ উপায় নেই।

৭। যতক্ষণই জপধ্যান কর – তা ১০ মিনিট কর সেও ভাল, কিন্তু সেটুকু প্রাণমন ঢেলে দিয়ে করবে। তিনি অন্তর্যামী, ভেতর দেখেন, তিনি তো আর কতটুকু সময় ধ্যান করলে বা কতবার জপ করলে তা দেখবেন না।

৮। প্রথম প্রথম জপধ্যান নিরিসই লাগে, তবু ওষুধ গেলার মতো করে যাবে। ৩-৪ বৎসর নিষ্ঠার সহিত করলে তবে আনন্দ পাবে। তখন একদিন না করলে ভারি কষ্ট হবে, কিছু ভাল লাগবে না।

৯। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে পুরুষকার দরকার। আমি নিজের চেষ্টায় সাধন-ভজন করে ভগবান লাভ করবো, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে নিষ্ঠার সহিত ৩-৪বৎসর রোজ অন্ততঃ সকাল ও সন্ধ্যায় প্রত্যেক বারে ২ ঘন্টা করে আসনে বসে জপধ্যান করে যাও দেখি।

১০। সংসারীর পক্ষে বেশী প্রাণায়াম করা ভাল নয়। যারা বেশী প্রাণায়াম করতে ইচ্ছুক, তাদের যথাসময়ে পরিমিত পুষ্টিকর সাত্ত্বিক আহার, নিয়মিত কার্যকলাপ, উদ্বেগশূন্য জীবন, স্বাস্থ্যকর নির্জন স্থান, বিশুদ্ধ বায়ু, কোষ্ঠ পরিস্কার, স্বল্পভাসী হওয়া – এ সব চাই। আর সর্বোপরি ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা চাই। এসবের ব্যতিক্রম হলে হৃদরোগ, বা মস্তিষ্কের রোগ হবার সম্ভাবনা।

১১। জপধ্যান করতে করতে যখন মন স্থির হবে, শুদ্ধ হবে, তখন তোমার মনই তোমার গুরু হবে, অন্তর হতেই সকল বিষয় বুঝতে পারবে, সংশয় ও প্রশ্নের সমাধান পাবে। তোমাকে পর পর যা করতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, মনই সব বলে দেবে।

১২। জপ করার সময় ইষ্টমূর্তি ধ্যান করবে, নইলে জপ জমে না। পূর্ণমূর্তির ধ্যান না এলেও যেটুকু আসে তাই নিয়ে ধ্যান আরম্ভ করবে। না পারলেও বার বার চেষ্টা করবে। না এলে ছাড়বে কেন? নাছোড়বান্দা হয়ে করতেই হবে। ধ্যান কি সহজে, মনে করলেই হয়? মনকে অন্য বিষয় থেকে গুটিয়ে এনে ধ্যেয় বস্তুতে রাখবার চেষ্টা বার বার করতে হবে। করতে করতেই হবে।

১৩। জপ – করগণনা, মালা করা, সংখ্যা রাখা – এসব শুধু মনকে অন্য বিষয় থেকে উঠিয়ে আনবার, ধরে রাখবার জন্য। তা নইলে মন কখন এ দিক ওদিক চলে গেছে, বা কখন তন্দ্রা এসেছে, জানতে পারবে না। তাই এই সবের দ্বারা প্রথম প্রথম একটু বিক্ষেপ হলেও এদিকে নজর রাখতে পারবে, সহজে এগুলি ধরতে পারবে ও মনকে ফিরিয়ে এনে ধ্যেয় বস্তুতে আকৃষ্ট করে রাখতে পারবে।

১৪। নিজেকে কখনও দুর্বল মনে করবে না। নিজের উপর খুব বিশ্বাস রাখবে। ভাববে আমার অসাধ্য কি আছে, আমি মনে করলে সব করতে পারি। মনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে যাবে কেন? জানবে মনকে বশ করতে পারলে সমস্ত জগৎ তোমার বশে আসবে, তুমি বিশ্বজয়ী হবে। যার নিজের উপর প্রত্যয় নেই সেই যথার্থ নাস্তিক। যার নিজের উপর প্রত্যয় নেই তার কথা কেউ শোনে না, ভগবানও তার কথা (প্রার্থনা) শোনেন না।

১৫। যেভাবে স্থির হয়ে (না নড়ে) ও সুখে (আরামে) অনেকক্ষণ বসতে পারা যায় – তাকেই আসন বলে। কিন্তু মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে হবে, আর বক্ষঃস্থল, গ্রীবা (গলা) ও মস্তক সোজা ভাবে রাখতে হবে, যেন দেহের সমস্ত ভারটি পঞ্জরগুলির উপর পড়ে – বক্ষদেশ যেন নীচের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। হেঁট হয়ে ঝুঁকে বসা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

১৬। সংসার অসার, অনিত্য, তিনি একমাত্রন সার সত্য, এই ভাবটি যতদিন মনে দৃঢ় না হয়, ততদিন ধ্যান করবার সময় মন চঞ্চল হবেই। ইন্দ্রিয়সুখে যত বিতৃষ্ণা আসবে, ভগবানে অনুরাগ ততই বাড়বে, মনও তত একাগ্র হবে। তাঁর প্রেমের স্বাদ কণিকামাত্রও পেলে জগতের সমস্ত সুখ তুচ্ছ, ঘৃণ্য হয়ে যাবে।

১৭। জপ, ধ্যান, পূজা, প্রার্থনা, স্মরণ-মনন, সদ্গ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ, সদালাপ, নিভৃতে বাস ও অধ্যাত্মচিন্তা – যখন যে ভাবটা আসে ও করতে ইচ্ছা হয়, এবং ভাল লাগে ও করবার সুবিধা পাও, তখন সেইটা করবে। তবে ধ্যানজপই হল আসল, সেটা অসুখবিসুখ, আপদবিপদ হলেও কোন দিনই বাদ দেবে না। বেশী না পারলে, বা সুবিধা না হলে অন্ততঃ ১০-১৫ মিনিটও প্রণাম প্রার্থনা ও জপ করবে।

১৮। ডাক্তারী বই পড়ে নিজের রোগ নির্ণয় করতে যাওয়া ও ওষুধ খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রোগ হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয়। সেই রকম কতকগুলো বই ও শাস্ত্র পড়ে সেই অনুযায়ী সাধন করতে গেলে চিত্তবিভ্রম হয়, গুলিয়ে যেতে হয়, এ কটানা এগিয়ে যাওয়া যায় না; এমন কি, অনেক সময় বৃথা শ্রম ও নিজের অনিষ্টও হয়। কেননা নানা শাস্ত্র অধিকারিভেদে বা অবস্থা-অনুযায়ী একই বিষয়ে বিভিন্ন বা পরস্পর-বিরোধী উপদেশ বা পদ্ধতি আছে। ঠিক তোমার পক্ষে কোন্‌টি উপযোগী, নিজে নিজে নির্ণয় করা অনেক সময় বিপজ্জনক। সে বিষয়ে গুরুই ঠিক পথ বলে দিতে পারেন। তাই গুরুমুখে বিদ্যালাভ করতে হয়। তিনি যা দীক্ষা ও শিক্ষা দেবেন তাই জানবে তোমার একমাত্র পথ। তাতে এবং তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠাপূর্বক সাধনভজন করলে কালে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয় হবে। কারো কথায় সে পথ ছেড়ে অন্য পথ কখনও ধরবে না, তা হলে পথ খুইয়ে ঘোরাঘুরিই সার হবে, কোন কালে কিচ্ছু হবে না।

১৯। বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব হয়। বিশ্বাস ডাঙ্গায় ডিঙ্গি চালায়, সংশয়ে হাঁটুজলেও ডুবে মরেত হয়।

২০। আশাই জীবন, সকল শক্তি ও চেষ্টার উৎস। আশা ছাড়লেই নির্জীব, জীবন্মৃত হ'তে হয়। যতক্ষণ শ্বাস তৎক্ষণ আশ। ভগবানকে লাভ করবার আশা মৃত্যু পর্যন্ত ছাড়বে না। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে কৃপা করতে পারেন। হয়তো তিনি অন্তিম সময়েও দেখা দেবেন, এই বিশ্বাস রাখবে।

২১। ভগবান যখন তাঁর অসীম কৃপায় গুরুমুখে তাঁর সিদ্ধমন্ত্র দিয়েছেন, তাঁকে পাবার চাবিকাঠিটি

দিয়েছেন – তখন জানবে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমার সেইটি ধারণা হওয়া চাই। যদি সেই অমূল্য রত্নকে অযত্নে ও অবহেলায় হারাও তো জানবে তুমি তাঁর কৃপার অযোগ্য। তার কদর করা মানে গুরুদত্ত মন্ত্র ও উপদেশ সর্বান্তঃকরণে সাধন ও পালন করা, যতদিন না বস্তু লাভ হয়। তাহলে গুরুর ঋণের কথঞ্চিৎ প্রতিদান করা হবে। ভগবানকে যত আপনার হতে আপনার বলে জানবে, ততই তুমি তাঁর কৃপার অধিকারী হবে, তাঁর কৃপায় এ জন্মেই জীবন্মুক্ত, নিত্যানন্দময় হবে।

২২। প্রেম অনুরাগ যতদিন না আসে ততদিন সংসার কখনই অনিত্য ও অসার বলে বোধ হবে না। মন তো একটি বই দুটি নয়, আর মনকে ভিন্ন ভিন্ন কামরায় (compartment-এ) ভাগ করা যায় না যে, কতকটা ভগবানে দেবে আর কতকটা বিষয়-বাসনায় ভরে রাখবে। সব মন ভগবানে না দিলে তাঁকে লাভ করা যায় না, ফলে বারে বারে সংসারে আসা-যাওয়া ও অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়।

২৩। সংসার ত্যাগ করতে হলে যে সন্ন্যাসী হয়ে বনে যেতে হবে তা নয়। আসল ত্যাগ হচ্ছে মনে। মনে ত্যাগ করলে সংসারেই থাক আর বনেই থাক, একই কথা। মনে ত্যাগ না করে বনে গেলেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে যাবে ও ভোগাবে, নিস্তার পাবে না।

২৪। সংসার যদি করতেই হয় তো ভগবানকে নিয়ে সংসার কর। যা কিছু দেখবে, শুনবে, ভাববে সবই ভগবান। ভগবানের সঙ্গে খেলা, মা-ই খেলুড়ী। মা আমায় নিয়ে খেলা করছেন জানলে জগৎটা আর এক রকম হয়ে যাবে। তখন দেখবে জগৎসংসারে সুখও নেই, দুঃখও নেই, অভাব নেই, অশান্ত নেই; রাগ, দ্বেষ, হিংসা, মোহ নেই; স্বার্থ, দ্বন্দ, আমি-আমার নেই, আপন-পর নেই, ছোট বড় নেই – কেবল আছে অফুরন্ত আনন্দ, অসীম প্রেম। সে আনন্দের কণামাত্র পেলে বিষয়ের আনন্দ তুচ্ছ হয়ে যায়, সে প্রেমের এক কণা পেলেও সমস্ত জগৎ আপনার হতেও আপনার হয়ে যায়, প্রতি লোমকূপে অপার্থিব সুখভোগ হয়। সে খেলায় ভয় নেই, ভাবনা নেই, বন্ধন নেই, নিত্যই নূতন খেলা। মা যে কত খেলাই জানেন, কত রূপে কত ভাবে যে খেলেন তার ঠিক ঠিকানা নেই, ভেবে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে হয়, তন্ময় হয়ে যেতে হয়। তখন খেলা বন্ধ হয়ে যায়, তখন কে কার সঙ্গে খেলবে! সে ভাব, সে অবস্থা যে অবাঙ্মনসগোচর! সে যে কি মজা! "বোঝে প্রাণ বোঝে যার!"

২৫। সংসারের সব সুখটুকুও চাই আবার ভগবানকেও পেতে চাই, তা হয় না গো হয় না।

২৬। যদি ভগবান এসে বলেন, তুই আমাকে চাস, না স্ত্রীপুত্র, নাতিপুতি নিয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে সুস্থ শরীরে শতাধিক বৎসর বেঁচে থাকতে চাস? তা হলে দেখবে, কোটি লোকের মধ্যে জোর করে একজন ছাড়া বাকি সকলে শেষেরটিই চাইবে।

২৭। ভগবানকে পেতে হলে যোল আনা মনপ্রাণ দিতে হবে – এক পাই, এক কড়া ক্লান্তি কম হলেও চলবে না। আমরা চাই, কিছু না খেটেখুটে সহজে ও সব দিক বজায় রেখে যদি তাঁকে পাওয়া যায়! যদি গুরু কৃপা করে পাইয়ে দেন তো কথাই নেই! তা কি হয় গো? ""সে যে কড়ার কড়া তস্য কড়া আপন গণ্ডা বুঝে লবে।"

২৮। যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়; যে তাঁকে না চায় তাকে পাঁচ ভূতে নাচায়।

২৯। বিজ্ঞাপন পড়ে আট আনা ভরি সোনা কিনতে অনেকে ছোটে। কিন্তু আসল সোনাই সোনা, অন্য সোনা সোনা নয় – মেকী, ভুয়ো, আট আনাই নষ্ট।

৩০। প্রার্থনা, বাঁধা গৎ আওড়ানো নয় – তাতে কোনই ফল হয় না। যা প্রার্থনা করছো, তার জন্য অন্তর থেকে ঠিক ঠিক অভাব বোধ করা চাই, অভাবের তাড়নায় মহাকষ্ট ও যাতনা ভোগ করা চাই। কিসে, কি করলে তা লাভ হবে, তার জন্য ব্যাকুল হতে হবে, তা হাজার কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলেও পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, যেন সেইটি পাওয়াার ওপর তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে – তবে তো প্রার্থনা সফল হবে, যা চাইছো তা পাবে! সেই রকম প্রার্থনাই ভগবান শোনেন ও পূরণ করেন।

৩১। জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম নিজে অর্জন করতে হয়; খুব খাটতে হয়, তবেই নিজস্ব হয়, স্থায়ী হয়, মন

ভরপুর হয়ে থাকে। কেউ কাউকে এসব দিতে পারে না। সাধন চাই, তবে সিদ্ধিলাভ হয়। যেমন সাধন তেমনি সিদ্ধি। বিনা সাধনে বা চেষ্টায় যা পাওয়া যায় তার গুরুত্ব থাকে না, কদর হয় না, পেয়েও তেমন সুখ হয় না। তা যেমন সহজে আসে তেমনি সহজে চলেও যায়। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে, আপদে বিপদে নানা পরীক্ষায় প্রলোভনে সেটা বড় বেশী কাজে আসে না, কোথায় ভেসে যায়। ধর্মভাব নিজস্ব করা মানে নিজেকে তদ্ভাবে ভাবিত করা, যাতে নিজের স্বভাব একেবারে বদলে গিয়ে যেন আর এক মানুষ হয়ে যাওয়া – এই শরীরেই নবজন্মলাভ করা। এ কি চারটিখানি কথা? উঠে পড়ে জীবনপণ করে লাগলে তবে হয়। আর যতদিন সিদ্ধিলাভ না হয় অবিরাম অনন্যমনে সাধন করে যেতে হবে।

৩২। আপনাকে দাও তো আপনাকেও পাবে, পরও আপনার হবে। যত আপনাকে বাঁচাতে যাবে, তত আপনাকে খোয়াবে,আপনও পর হয়ে যাবে।

৩৩। অবিরাম সংগ্রাম চালাও। বীরের মত লড়ো, পেছনে ফিরে চেয়োও না, এগিয়ে চল। অবসন্নই হও বা ক্ষতবিক্ষতই হও, ভ্রূক্ষেপ করো না। অভীঃ অভীঃ – ভয়শূন্য হও। কিসের ভয়? পরাজয়ের কথা মনে স্থান দিও না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন। হয় জয়, নয় মরণপণ। মরতে হয় তো বীরের মতো মর। তবে তো কেল্লা ফতে হবে।

৩৪। "আমি অতি দীনহীন দুর্বল, আমি কিছু পারবো না," বলে মিছে কাঁদুনি গেয়ে কোন ফল নেই। ওসব নড়েভোলা, নিষ্কর্মা, নপুংসকের লক্ষণ। তাদের দ্বারা কি কোন কাজ হয়? উঠে পড়ে লেগে যাও, তবে তো হবে। রাস্তা অনেক দূর ও দুর্গম বলে বসে থাকলে কি রাস্তা ফুরোবে? ওঠ পথ চলতে শুরু কর, অমনি পথ কমতে শুরু হবে। তবে তো আশা হবে, সাহস আসবে, বল আসবে, অপ্রত্যাশিত সাহায্য আসবে, পথও ক্রমশঃ সহজ ও সরল হয়ে আসবে। দেখতে দেখতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে। তখন কি আনন্দ!

৩৫। অনেকের ধারণা যে সদ্‌গুরুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে তাঁর কৃপায় সব দুঃখ ঘুচে যাবে। তখন দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যাবে, মনের মত চাকরি হবে, ঐহিক সুখ সম্পদ লাভ হবে, কন্যাদায় হতে মুক্ত হবে, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় পাশ হবে, মামলায় জিত হবে, ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হবে, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা, অশান্তি দূর হবে, শনির দশা কেটে যাবে, আরও কত কি অলৌকিক বা অপ্রত্যাশিত ভাবে হবে! তাদের জানা উচিত যে, দীক্ষা বা ধর্মলাভের সঙ্গে এসব ঐহিক লাভের ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ নেই। আর এ সকলের জন্য গুরুর কাছে আবদার করা মহা হীনতা, ধর্মভাবের মোটেই লক্ষণ নয়। গুরু তো আর হর্তা কর্তা বিধাতা নন। তাঁকে এসবের জন্য ব্বিব্রত ও জ্বালাতন করা অত্যন্ত অন্যায়। তাতে তাঁর আশীর্বাদলাভের চেয়ে বিরাগভাজনই হতে হয়। তাঁর সঙ্গে মাত্র পারমার্থিক ব্যাপারের সম্বন্ধ।

৩৬। সকামভাবে সেবা বা উপাসনা ব্যবসাদারী মাত্র। তাতে ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হয় না, ফললাভ যা হয় তা অতি সামান্য, তুচ্ছ, অস্থায়ী, সহজে ক্ষয় হয়ে যায়। সকাম উপাসনায় চিত্তশুদ্ধি হয় না, ভক্তি-মুক্তি, বা শান্তি ও আনন্দলাভও হয় না! শ্রীশ্রীঠাকুর কামনা করে দেওয়া জিনিস গ্রহণ করতে এমন কি ছুঁতেও পারতেন না।

৩৭। তাঁকে এই জীবনে পেতে হলে নিজের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য দিয়ে সাধনভজন করতে হবে, তাঁকে সর্বস্ব অর্পণ করতে হবে, ষোল আনার ওপরও যদি সম্ভব হয় দিতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন – পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসভক্তির কথা, অর্থাৎ যেন পাত্র ছাপিয়ে গড়িয়ে যায়। সে ক'জনের হয়? তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। নিজের শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য করে যাও। জানবে যতই কর না কেন, তাঁকে পাবার পক্ষে তা কিছুই নয়, তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হবার নয়।

৩৮। তবে তাঁর কৃপা তার উপরই হয় যাকে তিনি দেখেন যে, সে যথাসাধ্য করছে, নিজেকে মোটেই বাঁচিয়ে চলেনি, ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে পড়েও হাল ছাড়েনি, যে অনেক যুঝে অবশেষে বুঝেছে যে তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে লাভ করা নিজের চেষ্টায় অসাধ্য। যখন সে চারিদিকে অন্ধকার, অকূলপাথার দেখে হাবুডুবু খেয়ে অবসন্ন হয়ে ডুবে যাবার মতো হয়, তখনই তিনি তাঁর পদ্মহস্ত দিয়ে তাকে উঠিয়ে নেন, তাকে জন্ম-মৃত্যুর পারে নিয়ে যান, যেখানে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শান্তি – যে আনন্দের এক কণা পেলে

জীব নিজেকে পরম সুখী মনে করে।

৩৯। সংসারকে অত ভয় করলে কি চলে? বীর হওয়া চাই, সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। আমি অতি দুর্বল, আমি অতি হীন, অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছু হবে না – এসব ভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোনকালেই কিছু হবে না। ওসব ভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বীরের মত বলবে, "আমার অসাধ্য কি আছে – আমি অমৃতের পুত্র,অমৃতত্বে আমার জন্মগত অধিকার, কোন কিছুতেই আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।"

৪০। যখনই মনে দুর্বলতা বা অবসাদ আসবে, এ ই শ্লোকটি আবৃত্তি করবে -

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত-স্বাভাববান্॥"

– আমি দেবতা, আমি অন্য কিছু নই আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ

– কোন শোক আমাকে স্পর্শ করে না। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ-নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

৪১। তাঁকে যত পার স্মরণ-মনন করবে, তাঁকেই একমাত্র আপনার জন বলে জানবে, তাঁকে আপনার চেয়েও আপনার বলে জানবে। যিনি ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল, তাঁকেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। যে যাকে ভালবাসে সে তারই কথা ভাবে, ভেবে সুখ পায়, আনন্দ পায়, তাকে পেতে চায়, সর্বক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে রাখতে চায়, আপনার করে নিতে চায়। অন্য কথা বা কাজ তার ভাল লাগে না, অন্য কিছু সে চায় না, সব কিছুর বিচ্ছেদ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমের শেষ নেই, সে যে অফুরন্ত ভাণ্ডার। যত পান করবে ততই পিপাসা বাড়বে, শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে আপনাকে ভুলে তন্ময় হয়ে যাবে। তখন জীবত্ব ঘুচে দেবত্ব পাবে, শবত্ব ঘুচে শিবত্ব পাবে, মৃত্যুর বদলে অমৃতত্ব পাবে।

৪২। উপদেশ তো কত শুনেছ, বইয়ে পড়েছ। সে সব যদি কতক পরিমাণেও পালন করতে চেষ্টা না কর তো হাজার উপদেশ দিলেও কোন ফল হবে না। কেউ তোমায় কিছু করিয়ে দিতে পারবে না, নিজেকে সব করতে হবে। যে জীবনমরণ পণ করে উঠে পড়ে লাগে, তাকেই ভগবান সাহায্য করেন, কৃপা করেন। এমন কি তার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে পথ এগিয়ে দিয়ে আসেন। প্রথমে পুরুষকার, পরে কৃপা, শেষে বস্তুলাভ।

৪৩। ঠিক ঠিক ধর্মলাভ বড় কঠিন কথা, যার তার হয় না। ভেতরে কিছু পদার্থ থাকা চাই। সুকৃতি বা শুভসংস্কার, সরলতা, আন্তরিকতা, অভাববোধ, এই সব। ""ভিজে আসার কাঠ" দেখলে অমন দয়াল ঠাকুরও তার দিকে ফিরে চাইতেননা, – বলতেন, এ দের এ জন্মে হবার নয়। ভিজে কাঠ অর্থাৎ ঘোর সংসারী বদ্ধজীব।

৪৪। জোর করে বেশী জপ ধ্যান করতে নেই, যাতে অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ হয়। তাতে বরং হিতে বিপরীত হয়। ধীরে ধীরে ক্রমশঃ জপধ্যান বাড়াবে। আন্তরিকতা ও দৃঢ়সঙ্কল্প থাকলে তাঁর কৃপায় সময়ে সব হবে, সব পাবে।

৪৫। খুব নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে জপধ্যান করে যাও। ক্রমে মন স্থির হবে, ধ্যান জমবে – ওটা একটা নেশা দাঁড়িয়ে যাবে। একদিন না করলে কিছুতেই ভাল লাগবে না, মহা অস্বস্তি বোধ হবে, যেমন নেশাখোরদের নেশার জিনিস না পেলে হয়। তখন আর সব আলুনি হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় ওতেই ডুবে থাকি।

৪৬। শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি – দুয়ে এক, একে দুই, পরমার্থতঃ অভেদ। ভেদকল্পনা – যতক্ষণ আমাদের দ্বৈতবুদ্ধি আছে, উপাস্য-উপাসক ভাব আছে।

৪৭। গুরু, ইষ্ট ও দেবদেবীর স্বপ্ন দেখা খুব ভাল। এতে মনে খুব উৎসাহ, আনন্দ হয়। তবে না দেখতে পেলেও মন খারাপ করবে না। ওরকম স্বপ্ন দেখলে যার তার কাছে বলে বেড়াবে না, ইচ্ছে হলে গুরুকে বলতে পার। আর স্বপ্নের প্রত্যেক অংশের মানে কি তা নিয়েও মাথা ঘামাতে যাবে না। স্বপ্ন স্বপ্নই, সবটার মধ্যে একটানা সামঞ্জস্য থাকবে, এ রকম আশা করা বৃথা। সে একমাত্র আদেশ বা ধ্যানে

সাক্ষাৎ দর্শন বা উপলব্ধিতেই হয়, যার সত্যতা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আর যা লাভ করলে মানুষের জীবন বদলে যায় – মানুষ দেবতা হয়। সে যার তার হয় না, বহু সাধন ও তাঁর কৃপা সাপেক্ষ।

৪৮। কেউ কেউ স্বপ্নে মন্ত্র পায়। কিন্তু দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সেটা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, অথবা নিজের কল্পনা বা চিন্তাপ্রসূত। তবে দৃঢ়বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত জপ করে গেলে কালে তা থেকেও সিদ্ধিলাভ হতে পারে।

৪৯। নিরিবিলি জায়গায় ক্ষীণ আলোয় বা অধকারে ধ্যান করবে, কাপড়চোপড় আলগা বা ঢিলে রাখবে, মুখ বুজে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস্প্রশ্বাস ফেলবে। ধ্যান করবার সময় ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করবার চেষ্টা করবে। চোখ বুজে (মানস) দৃষ্টি হৃদয়ে অর্থাৎ নিজের অন্তরের অন্তরে রাখবে ও ভাববে সেখানে ইষ্ট বিরাজ করছেন।

৫০। ধ্যান করবার সময় দেহাত্মবোধ অর্থাৎ এই দেহ বা ব্যক্তি আমি – এভাব ভুলে যাবে, নিজেকে অহং-অভিমানী বোধস্বরূপ সূক্ষ্মসত্তা ভাববে, আর ইষ্টকে ভাববে উপাধিরহিত, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত চৈতন্যস্বরূপ। তিনি তোমার মধ্যে বোধে বোধস্বরূপ রয়েছেন, আবার তুমি তাঁর মধ্যে রয়েছ, বোধে বোধস্বরূপ। এসব সাধনসাপেক্ষ, কথায় বোঝানো যায় না। 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।'

৫১। ধ্যান করবার সময় ভাববে, 'হে প্রভু, পরমার্থতঃ আমি তোমারই স্বরূপ, কেবল মায়া মোহে অন্ধ হয়ে, আমি আমি, আমায় আমার করে, দেহেতে আত্মবুদ্ধি করে, কুচিন্তা, কুবাসনা, কুপ্রবৃত্তির বশ হয়ে আমার এই দুর্দশা হয়েছে। আমি রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, ভয় ও ভাবনাগ্রস্ত, দীন, হীন, মলিন, মৃত্যুর অধীন, বিষয়ের অধীন, অসহায়, নিরুপায়, নিঃসম্বল, ক্ষুদ্র, দুর্বল, অপদার্থ হয়ে পড়েছি। হে প্রভু, তুমি নিজগুণে দয়া করে আমার সমস্ত পাপরাশি, দোষরাশি, অভাবরাশি, দুর্দশারাশি সমূলে বিনাশ কর, যাতে আমি তোমার নিত্য সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি, যাতে আমি আমার যা যথার্থস্বরূপ – নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব – তা উপলবদ্ধি করতে পারি, আমার ভেতর যে অনন্তশক্তি নিদ্রিত নির্জীব অবস্থায় রয়েছে, তাকে যেন জাগ্রত করতে পারি।'

৫২। ধ্যান করতে গেলে একটু কল্পনাশক্তির দরকার। খালি কাঠখোট্টা শুষ্কভাব ও জড়দৃষ্টি হলে চলবে না। শরীরের মধ্যে যে ষট্‌চক্র - ছ'টা পদ্ম বা নাড়ী-গ্রন্থি (nerve-plexus) আছে, তাদের স্থূল অস্তিত্ব নেই, চাক্ষুষ দেখা যায় না। তাদের কল্পনা করে নিয়ে, তাদের মহাশক্তির আধার ভেবে তাতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। যত ধ্যান গাঢ় ও গভীর হবে, তত চিত্ত স্থির ও শুদ্ধ হবে, অন্তরের প্রসুপ্ত শক্তি তত জাগ্রত ও বিকশিত হবে।

৫৩। প্রাণায়াম চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় করবে। তখন ইষ্টমূর্তির ধ্যান না করে নিয়মিত সংখ্যায় জপ করবে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে নজর দেবে। বাঁ হাতে, যেমন সচরাচর গাঁটে গাঁটে আঙ্গুল রেখে গণনা করে, সেইভাবে তখন সংখ্যা রাখবে। নিঃশ্বাস নেবার সময় মনে করবে পবিত্রতা, দয়া, বলবীর্যাদি সদ্‌গুণ তোমার ভিতর দিকে টেনে নিচ্ছ; প্রশ্বাস ফেলবার সময় ভাববে তোমার অন্তরের কুভাব, মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা, হিংসা, পাপবুদ্ধি, এই সব গলদ বের করে দিচ্ছ।

৫৪। ধ্যান করবার সময় ইষ্ট আমার অন্তরে, হৃদয়-কমলে বিরাজ করছেন, এইভাবে করতে না পার তো, তিনি আমার সম্মুখে সাকারমূর্তিতে, কমলে বা সিংহাসনে অবস্থান করছেন , এইভাবেও করতে পার। তবে আগেরটি প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাতে তাঁকে নিজের অন্তরের অন্তরে রাখা ও দেখা যায়। অপরটিতে তিনি আমার বাইরে রয়েছেন মনে করতে হয়। তবে ক্রমশঃ তাঁকে অন্তরে দেখবার ও ভাববার চেষ্টা করবে। যে যাকে যত ভালবাসে, সে তাকে তত অন্তরের অন্তরে রাখতে চায়, ইচ্ছা করে যে হৃদয়ের ভেতর পুরে রাখি। 'মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।'

৫৫। সকাল-সন্ধ্যায় বসে জপধ্যান বেশী করতে না পারলে অন্য সময়েও যখন কোন কাজকর্ম করছো না তখন বসে, শুয়ে বা খাবার পর দু'এক ঘন্টা বিশ্রাম করে, বা শেষরাত্রে বিছানায় বসেও করতে পার, যদি নিদ্রা বা আলস্য না আসে। তখন আসনে বসে যথাবিধি করলে মনঃসংযম সাধারণতঃ বেশী

হয়। চলতে ফিরতে বা কোন কাজ করবার সময়ও মনে জপ করে পার স্মরণ-মনন হিসাবে। তখন ধ্যান করবে না, কারণ অন্যমনস্ক হলে বিপদ-আপদের (accident-এর) সম্ভাবনা আছে। সময় অমূল্য জিনিস, জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত, এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করবে না।

৫৬। দোষে গুণে মানুষ। দোষগুণ কমবেশী সকলেরই আছে। পরের দোষত্রুটি অনুসন্ধান না করে বরং নিজের কর। পরের গুণকে এবং নিজের দোষকে বড় করে দেখবে। পরের দোষকে এ বং নিজের গুণকে ছোট করে দেখবে। মাছি ব্রণে বসে, মৌমাছি ফুলে। পরচর্চায় আত্মচর্চার ক্ষতি হয়।

৫৭। এক অবতার পুরুষই দোষত্রুটিশূন্য ও সর্বগুণান্বিত হতে পারেন। এমনকি, সিদ্ধপুরুষ, আচার্য ও সদ্‌গুরুরও ব্যবহারিক কার্যকলাপে দোষত্রুটি, ভ্রমপ্রমাদ কিছু না কিছু থাকতে পারে। কিন্তু তাঁদের সদ্‌গুণ এত বেশী যে দোষগুলোও ভূষণস্বরূপ হয়। আবার যে যাকে ভালবাসে তার কুরূপ বা দোষ তার চোখে পড়ে না।

৫৮। গুরুর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না থাকলে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভ করা যায় না। গুরুবাক্যে কখনও অবিশ্বাস বা সংশয় করবে না, গুরুবাক্য বেদবাক্য বলে জানবে। গুরুর উপদেশ নির্বিচারে সর্বান্তঃকরণে পালন করবার চেষ্টা করবে, যদি বস্তুলাভ করতে চাও। জানবে গুরুর মতন তোমার ইহকাল-পরকালের হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। গুরুপদিষ্ট পন্থা নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করাই তাঁর যথার্থ সেবা করা। তাতেই তিনি সব চেয়ে বেশী প্রীত হন।

৫৯। জপ প্রথম প্রথম মনে মনে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে করতে হয়। তাই দেরী হয়, হয়তো ঘন্টায় দু'তিন হাজারের বেশী হয় না। ক্রমে ক্রমে বেশীক্ষণ ধরে অভ্যাস করলে তাড়াতাড়ি করা যায়, তখন ঘন্টায় ৮-১০ হাজারও অনায়াসে করা যায়। জপ করবার সময় মনকে মন্ত্রে ও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ইষ্টে একাগ্র করবার চেষ্টা করবে।

৬০। নিজে না চেষ্টা করলে গুরু তোমায় বস্তুলাভ করিয়ে দিতে পারেন না। গুরু তোমায় পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, ভুল ও সংশয় দূর করতে পারেন, বিপথে গেলে সাবধান করতে পারেন, পথে উঠিয়ে দিতে পারেন, এমনকি খানিকটা দূর হাত ধরে নিয়ে যেতেও পারেন। তবে নিজে পথ হাঁটা চাই – তিনি তো তোমায় ঘাড়ে করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবেন না। পথ দীর্ঘ ও দুর্গম সন্দেহ নেই তা বলে পারবো না বলে রাস্তার মাঝে বসে থাকলে, ভয় পেলে বা আশা ছেড়ে দিলে চলবে না। হয় তোমায় এগুতে হবে, নয় তো পেছুতে হবে। পেছুলে যেটুকু পেয়েছ সেটুকুও খোয়াতে হবে। যত এগুবে ততই পথ সুগম হয়ে আসবে, সাহস ও শক্তি পাবে, আনন্দ পাবে।

৬১। নিজের ভেতরে পদার্থ না থাকলে হাজার সাহায্যেও কিছু হয় না। অনুর্বর, পাথুরে জমিতে বীজ বুনে জল ছেঁচায়, নিড়োনয় কি ফল হবে! খারাপ জমিকেও যেমন নানা উপায়ে ভাল করা যায়, তেমনি বিষয়ী লোকও গুরুদত্ত উপদেশ সরল বিশ্বাসে, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পালন করলে পরমার্থ-ফল লাভ করতে পারে। তখন জীবন মধুময় ও অমৃতময় হবে।

৬২। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, এদিক ওদিক চেয়ো না। জ্যোতিদর্শন ইত্যাদির দিকে আমলই দিও না। ধ্যান করতে করতে ওসব কত রকম আসবে, বেশ একটু আনন্দও পাবে। কিন্তু তাতেই আটকে যেও না, তাহলে আর বেশী দূর এগুতে পারবে না। সব সময় সমস্ত দৃষ্টি আদর্শের দিকে রাখবে, কিসে তাঁর প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা বাড়বে, তাঁতে মন তন্ময় হয়ে যাবে, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ হবে, তাই যেন তোমার একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য হয়।

৬৩। সিদ্ধাই, বিভুতি এ সব মানুষকে সুখের প্রলোভন দেখিয়ে মায়ামোহে আবদ্ধ করে, আদর্শভ্রষ্ট করে। এগুলো শুধুই যে ভগবৎ-লাভের মহাবিঘ্ন তা নয়, মানুষের ক্রমশঃ অধোগতি করে, তার সর্বনাশ করে। সিদ্ধাইয়ে ভক্তিমুক্তি লাভ হয় না, বড় জোর ইহজগতে মান, যশ ও নিজের অভিপ্রেত সুখসম্ভোগ হয়। আর তাই পাবার জন্য পরের সর্বনাশ করতেও পেছপা হয় না। তাই প্রকৃত ভক্তরা সিদ্ধাইকে বিষের মতো পরিহার করে।

৬৪। আমরা প্রার্থনা করি মুখে, অন্তর থেকে নয়, তাই কোন ফল হয় না। অন্তর থেকে হলে ফলবেই।

যখন জপধ্যান করে কিছুই ফল পাচ্ছ না মনে হবে, তখন নিজের ভেতর কোথায় কি গলদ আছে, পাত্রের কোন্ ফুটো দিয়ে সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই খুঁজে বার করবে ও শোধরাবার চেষ্টা করবে। সংসারে, বিষয়ে মায়ামোহ, কামকাঞ্চনে আসক্তি, এই সব পুরো মাত্রায় থাকলে জপধ্যানে আত্মার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। তা বলে জপধ্যান করা ছাড়বে না, কালে ফল পাবেই, ক্রমশঃ বিষয়সুখ অসার, আলুনি লাগবে ও ভগবানের প্রতি টান, অনুরাগ বাড়বে, তাঁতেই সুখ পাবে।

৬৫। আমরা মুখে মুক্তি চাই, সত্যি সত্যি নয়। ভগবান যদি এসে বলেন, "এই নে, তোকে মুক্তি দিচ্ছি", তখন ভয় পাবো, বলবো, "না না, এক্ষুনি মুক্তি চাইছি না; এখন মুক্তি পেলে আমার এদের গতি কি হবে? মরে গেলে তখন মুক্তি দিও।" কাঠুরের গল্প মনে আছে তো? বোঝার ভারে ক্লান্ত হয়ে যমের কাছে প্রার্থনা করেছিল, "আর পারিনে প্রভু, আমায় মুক্তি দাও।" যখন তিনি এসে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন সে বললে, "না না, ঠাকুর, এ ই কাঠের বোঝাটা উঠিয়ে দেবার জন্যে তোমায় ডাকছিলুম।" বদ্ধজীবের দশাও ওই রকম, তারা ঐহিক দুঃখেরই হাত থেকে মুক্তি চায়, আসল মুক্তি নয়।

৬৬। ভগবানকে চাও তো তাঁকে পাবে; বিষয় সুখ তাঁর কাছে চাও – তাও পাবে। কিন্তু দুয়েরই জন্য খাটতে হবে, না খাটলে কিছুই পাওয়া যায় না। সংসারের জন্যে, বিষয়সম্পত্তির জন্যে, মান-যশের জন্যে, দিনরাত আহারনিদ্রা ত্যাগ করে দেহমনপ্রাণ দিয়ে সকলে খাটছে, ভাবছে, এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেই, রেহাই নেই; তবুও যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে না, আশা-আকাঙ্খা মিটছে না। সেই রকম করে যদি ভগবানের জন্যে খাটতে পারতে তো ভগবানলাভ নিশ্চয় হতো। মণিকাঞ্চন ফেলে আমরা কাঁচ নিয়ে ভুলে আছি! বার বার ধাক্কা খাচ্ছি, তবুও চৈতন্য হয় না। এমনি মহামায়ার মায়া! ভগবান লাভ করা যেমন শক্ত তেমনি আবার সহজ, কেবল মনের গতির মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। তবে সেই পারে যার উপর মায়ের কৃপা হয়।

৬৭। না খাটলে অভীষ্ট-লাভ হয় না। এক শিশুই না খেটে পায়; সে জানে মা সব জানে। মা ছাড়া সে আর কিছু জানে না। যখন যা তার দরকার হয়, মা তাকে দেয়, তাকে নিজের জন্য ভাবতে হয় না। ধর্মজীবনেও ঠিক শিশুর মতো হতে হবে। শিশু যখন ক্ষিদে পায়, কাঁদে; অমনি মা সব কাজ ছেড়ে এসে তাকে কোলে নেয়, দুধ খাওয়ায়। তবেই হলো, শিশুকেও কাঁদতে হয়, অভাব জানাতে হয়। ভক্তকেও তেমনি ভগবানের নাম নিতে হয়, ভক্তিলাভের পিপাসায় আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে পাবার জনে কাঁদতে হয়। অন্য কিছু পেলে বা দিলে সেদিকে ফিরেও চায় না। সে চায় এ কমাত্র ভগবানকে, – তাঁর ঐশ্বর্যকে নয়। টাকাকড়ি তখন তুচ্ছ বোধ হয়ে যায়। রামপ্রসাদ গেয়েছেন –

"কাজ কি মা সামান্য ধনে,
ও কে কাঁদছে গো তোর বিহনে।
অন্য ধন দিলে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে,
দাও যদি মা অভয় চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে।"

৬৮। মনকে বশে আনাই আসল কথা। তা না করতে পারলে কিছু নয়। বলে –

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।"

'এক' হচ্ছে মন। মনকে জয় করতে পারলে জগৎকে জয় করা যায়। সেইজন্যই যা কিছু সাধনভজনের দরকার।

ঠাকুর একটি গান গাইতেন :-

"আমি জানি যে মন্তোর (মন্ত্র),
দিলাম তোরে সেই মন্তোর।
এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই।"

৬৯। সদ্গুরু সিদ্ধ-মন্ত্রই দেন, যে মন্ত্র জপে যোগী ঋষিরা সিদ্ধ হয়েছিলেন ও যা গুরুপরম্পরায় চলে আসছে। তিনি তো একটা মনগড়া যা তা দেন না। মন্ত্রে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা করতে নেই। মন্ত্র দীর্ঘকাল যথাবিধি জপ করে যদি মনের একাগ্রতা বা পবিত্রতা লাভ না হয়, জানবে মন্ত্রের নয়, তোমারই দোষক্রুটি তার কারণ। আর সেইগুলো শোধরাবার চেষ্টা না করলে, খালি মুখে জপ করলে বা অন্য গুরুকরণ করলে কি হবে? মন মুখ দুই-ই নিয়োগ করে জপ করতে হয়। মন মুখ এক করতে হয়।

৭০। মন্ত্রকে মহাশক্তির আধার, ইষ্টের স্বরূপ বলে জানবে। স্থূলকে ধরে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে ধরে মহাসূক্ষ্ম পৌঁছুঁতে হয়, যা বাক্য মনের অতীত – অবাঙ্মানসগোচরম্।

৭১। ধ্যানের গূঢ় রহস্য হচ্ছে – জীবাত্মার (অর্থাৎ অহং-অভিমানী চৈতন্যের) হৃদয়ে (অন্তরের অন্তস্তলে) তার যথার্থ স্বরূপ পরমাত্মাকে বা সগুণ-ব্রহ্ম পরমেশ্বর ইষ্টকে স্থাপনা করে, তাঁর জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, প্রেমময় রূপ ও ভাবে বিষয়াসক্তিবর্জিত মনকে যুক্ত বা তদ্‌গত করতে অভ্যাস করা। যখন সেই ভাব পাকবে বা পরিপূর্ণতা লাভ করবে, তখন সেটি নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত বইবে – তখনই মন ইষ্টে তন্ময় হয়ে যাবে। সেই অবস্থাকেই ভাব বা সমাধি বলে।

৭২। প্রত্যহ নিষ্ঠাপূর্বক জপধ্যান করবার অভ্যাস করলে সেটা একটা নেশার মতো হয়ে যাবে। আবার ধ্যান জমলে যেন একটা নেশার ভাব হয়, যেটা ধ্যানের পরও কম-বেশী কিছুকাল পর্যন্ত থাকে ও বেশ আনন্দ অনুভব হয়। তাই ধ্যানের পরই কিছুক্ষণ আসন ত্যাগ করবে না বা বৈষয়িক কথাবার্তা কইবে না। কইতে ইচ্ছাও হয় না, বাধে, কষ্ট হয়। সেই ভাবটা যতটা পার স্থায়ী করবার চেষ্টা করবে।

৭৩। মাতালরা বা আফিমখোরেরা যেমন সময়ে নেশার জিনিস না পেলে মহা অস্বস্তি বোধ করে, কিছুই ভাল লাগে না, সাধকেরও সেইরকম অবস্থা হয় যেদিন নিয়মিত ধ্যানজপ করতে না পারে। যে বিষয় অভ্যাস করবে, ভাল বা মন্দ, তাতেই একথা খাটে।

৭৪। "সংসারী আমাদের কি কিছু আশা আছে?" কেন থাকবে না? খুব আছে। ভগবান কি কেবল সন্ন্যাসীদের? সকলেই তাঁর সন্তান। সংসারী কে নয়? আমাদেরও তো সংসার আছে। দেখ না, এই তোমরা সব আছ, তোমাদের জন্য ভাবতে হয়, মঠ-মিশনের সাধুদের জন্য ভাবতে হয়, ঠাকুরের কাজের জন্য ভাবতে হয়। দুঃখ-দারিদ্র্য, সুখদুঃখের কথা শুনতে হয় এবং তাতে মনে কষ্ট হয়। তবে প্রভেদ আছে – আপনার আর পরের জন্য ভাবনা। বিদ্যার সংসার আর অবিদ্যার সংসার। সংসারে থাক ক্ষতি নেই, তবে সংসারে না পেয়ে বসে। বাহিরে সংসার থাক্, সংসারের কর্তব্য কাজ সব করে যাও, কিন্তু অন্তরে যেন ত্যাগের ভাব, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ভাব থাকে।

৭৫। সংসারটাকে যেন একটা দীর্ঘ স্বপ্ন বলে জানবে। যতক্ষণ আছে, ব্যবহারিক ভাবে সত্য জেনে নিজের কর্তব্য করে যাও। কিন্তু এটাও ধারণা রাখবে যে ত্রিকালে সত্য নিত্য বস্তু এক ভগবানই, যাঁকে লাভ না করা পর্যন্ত চরম সুখ, শান্তি, মুক্তি নেই। এ মন দুর্লভ মানবজীবন পেয়ে – এমন সুবিধা পেয়ে – তাঁকে পাবার চেষ্টা না করলে সকলই বৃথা।

৭৬। নিজের মনের মধ্যে যতক্ষণ সংসার আছে, বিষয়-বাসনা, আসক্তি আছে, ততক্ষণ বাইরে ত্যাগ করলে বিশেষ লাভ নেই। বাইরে ত্যগ করে যেখানেই পালাও – বনে, পর্বত-গুহায় – সংসার সঙ্গে সঙ্গে যাবে, কোন না কোন রকমে তোমায় ছলনা করবে ও নূতন নূতন বন্ধনে ফেলবে। গৃহীই হও বা সাধুই হও, আদর্শের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য না থাকলে, আদর্শকে দৃঢ়মুষ্টিতে এঁটে ধরে না থাকলে পতন অনিবার্য, কেউই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

৭৭। সর্বদা সজাগ থাকবে। নিজের মনকে কখনও বিশ্বাস করবে না। হাজার উচ্চ অবস্থা লাভ করলেও নিজেকে জিতেন্দ্রিয় মনে করবে না, কারণ তখনও পতন হতে পারে। পাপ সূক্ষ্মভাবে কখনও ধর্মের রূপ ধরে, কখনও দয়ার রূপ ধরে, কখনও বন্ধুর রূপ ধরে তোমায় ভুলিয়ে বশ করবার চেষ্টা করবে। কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, বুঝতে পারবে না। যখন বুঝতে পারবে, তখন হয়তো ফেরা অসাধ্য হবে।

৭৮। বরং বিবাহ করে গৃহস্থ হওয়া ভাল, কারণ এও একটি আশ্রম, আত্মার উন্নতি-সাধনের একটা পথ। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী কামকাঞ্চনের দাস হলে ইহকাল পরকাল হতে ভ্রষ্ট হয়। সংসারত্যাগীরা ও বিধবারা জ্ঞানতঃ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করবে। তাতে অশক্ত হলে বিবাহ করা ধর্মানুমোদিত, নিজের ও পরের কল্যাণের জন্যে। সেন্ট পল্ বাইবেলে বলেছেন, "কামাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বরং বিবাহ করা ভাল।"

৭৯। পুরুষ বা স্ত্রী প্রত্যেকেরই কোন না কোন

অর্থকরী বিদ্যা বা শিল্পাদি শিক্ষা করা একান্ত দরকার, যার দ্বারা নিজে স্বাধীনভাবে খেটেখুটে জীবিকানির্বাহ করতে পারে। পরবশ হওয়া মহাদুঃখকর, জীবনকে দুর্বহ করে দেয়, ধর্মকর্ম করা তো দূরের কথা।

৮০। গুরুদত্ত মন্ত্রের আপ্রাণ সাধনা ও গুরুর উপদেশ জীবনে পালন করবার প্রযত্নই যথার্থ গুরুদক্ষিণা – তাঁর প্রীতিলাভের ও নিজের সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

৮১। পিতা সন্তানের কাছে, গুরু শিষ্যের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করেন। সন্তান ও শিষ্য তাঁদের চেয়েও বড় হোক, এই তাঁরা চান।

৮২। ভগবানই গুরুর গুরু, পরমগুরু। তিনিই যন্ত্রী, মানুষগুরু তাঁর যন্ত্রস্বরূপ, যার মধ্য দিয়ে তাঁর শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়।

৮৩। সদ্‌গুরু মন্ত্রদীক্ষার মধ্যে দিয়ে শিষ্যকে তাঁর সাধনালব্ধ পরম গুহ্যতত্ত্ব দান করেন। তাঁকে ব্যাবহারিক বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে বা যাচাতে যাবে না। তা করতে গেলে হীরার দাম বেগুনওয়ালা যেমন ন'সের বেগুনের ওপর একটিও দিতে চায় নি, তাই করা হবে। এ সব তর্কবিচারের বস্তু নয়, গুহ্য (mystic) ব্যাপার, সহজে বোঝা যায় না। গুরুপদেশে বিশ্বাস করে সাধন ভজন করলে তবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, পর্দার পর পর্দা খুলে যায়।

৮৪। প্রত্যহ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও বসে জপধ্যান করবে। সময়াভাব? না আন্তরিকতার অভাব? সব কাজ করবার সময় মেলে বা সময় করে নাও হাজার তুচ্ছ কাজ হোক না; আর এক-আধ ঘণ্টা জপধ্যান করবার সময় পাও না! তৃষ্ণার জন্য যেমন জলের, ক্ষুধার জন্য যেমন আহারের, বাঁচবার জন্য যেমন বায়ুর প্রয়োজন, পরমার্থ বস্তুলাভের জন্য তেমনি জপধ্যান, প্রার্থনা, ক্রিয়াদির বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানের জন্যে অভাব বোধ জাগাতে হবে, প্রত্যহ ক্রিয়াদির অভ্যাস দ্বারা তা ক্রমশঃ আসবে, তাতে শক্তিসঞ্চয় হবে।

৮৫। অনেকে দীক্ষার পর গুরুকে বলে, "বাবা, আমরা কিছুই করতে পারবো না। এখন হতে আপনার ওপর সব ভার দিয়ে আমরা খালাস।" এ কেবল ফাঁকি দেবার, কিছু না করবার মতলব। ধর্মলাভ কি এতই সহজ, সস্তার জিনিস? "যেমন ভাব, তেমন লাভ।" মুখে বললেই কি ভার দেওয়া হল? সে অনেক সাধনসাপেক্ষ। নিজের অহংকে বলি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। দু'পয়সা রোজগারের জন্য দিনরাত টো টো করে ঘুরতে পার, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে খাটতে পার, আর জ্ঞান-ভক্তিলাভের বেলায় "আমরা কিছু করতে পারবো না!" বেশ মজার কথা তো! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরে কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য উপাসনা করলে তবে বস্তুলাভ হয়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" – মুক্তির অন্য পন্থা নেই।

৮৬। কেউ কারুর পাপের ভার নিতে পারেন না, গুরুও নয়। মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে গুরু তোমার সমস্ত পাপের ভার নিজের ঘাড়ে নিলেন মনে করা মহাভ্রম। এক ভগবানের অবতাররাই তা পারেন ও নেন, কারণ তাঁরা অহেতুক-কৃপাসিন্ধু, পাপিতাপি উদ্ধারের জন্যেই তাঁরা আসেন। ভগবানকে কোন পাপ স্পর্শ করতে পারে না; তবুও তিনি দেহধারণ করেন বলে সেগুলো তাঁকে রোগরূপে আশ্রয় করে দুঃখ ভোগ করায়। কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবলমাত্র অন্তর হতে তীব্র অনুতাপ দ্বারা এবং পাপকর্ম ত্যাগ করে সাধুজীবন-যাপন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। জ্ঞানাগ্নিই সমস্ত পাপ ভস্ম করে।

৮৭। ধর্মকে সকলেই বেওয়ারিশ মাল মনে করে। শাস্ত্রাদি চর্চা না করে, সাধনভজন কিছু না করে, ধর্মবিষয়ে মত বা বিধান দিতে সকলেই অগ্রসর হয়, নিজেকে expert বা সবজান্তা মনে করে। যে কোন একটা অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতে হলে কত বৎসর ধরে বিদ্বান শিক্ষকের কাছে শিখতে হয়, আর পরাবিদ্যা লাভ করতে, ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব জীবনে প্রতিফলিত করতে বহু আয়াস-সাধ্য শিক্ষাদীক্ষার দরকার হয় না মনে করা বাতুলতা মাত্র।

৮৮। দীক্ষা নেবার কিছুকাল পরেই অনেকে বলে, "মন স্থির হচ্ছে না কেন, ধ্যান ভাল হয় না কেন? মন যাতে স্থির হয় করে দিন।" মন স্থির হওয়া, ধ্যান হওয়া কি সহজ কথা? মন জন্মজন্মান্তরের

বিষয়াসক্তির সংস্কারবশে স্বভাবতই বহির্মুখ, অনবরত বিষয়ভোগ খুঁজে বেড়ায় ও তাতে রস পায়। এই চঞ্চল মনকে স্থির করতে গেলে অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছাড়া সহজ পথ short cut কিছু নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিষ্ঠাপূর্বক গুরুনির্দিষ্ট প্রণালীতে জপধ্যানই অভ্যাস করে যেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ে অনাসক্তি আনবার চেষ্টা করতে হবে। বিষয়ের উপর টান যত কমবে এবং ইষ্টকে যত ভালবাসবে ও আপনার হতেও আপনার বলে জানবে, ততই দেখবে মন আপনা হতেই স্থির ও শান্ত হয়ে আসছে। তখন ধ্যানও জমবে এবং আনন্দ ও শান্তি পাবে। একটু আধটু ধ্যান জপ করে আনন্দ না পেলে ছাড়তে নেই। আশু ফলের জন্য ব্যস্ত না হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই 'খানদানী চাষা'র মতো বরাবর লেগে থাকতে হয়। দশ বছর অজন্মা হলেও সে চাষ ছাড়ে না।

৮৯। দেবদর্শন বা সাধুদর্শনে এলে খালি হাতে আসতে নেই। অন্ততঃ দু'এক পয়সারও ফল, মিষ্টি বা অন্য কিছু, নিয়ে আসবে, অন্ততঃ দুটো ফুলও।

৯০। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, নির্যাতন, মনকষাকষি, ঝগড়া, অশান্তির কথা ক্রমাগত ভেবে ভেবে, হা হুতাশ করে মন খারাপ করবে না। তাতে কোন ফল নেই বরং ওই সব নিয়ে মনে মনে বা অপরের সঙ্গে যত আলোচনা করবে তত অশান্তি আরও বেড়ে যাবে, একগুণ দশগুণ হয়ে দাঁড়াবে ও জীবন দুর্বিষহ হয়ে বোধ হবে। যত পার সহ্য করে যাবার চেষ্টা করবে। কথায় কথা বেড় যায়, তাই কেউ কিছু বললে উপেক্ষা করে চুপ করে থাকাই ভাল। বোবার শত্রু নেই। "যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়" — ঠাকুর বলতেন। মিষ্ট কথায়, মিষ্ট ব্যবহারে, সেবায় ভালবাসায় সকলেই বশ হয়, আজ না হয় দুদিন পরে। মনে খুব জোর সঙ্কল্প আনবে, বার বার বিফল হলেও শোধরাতে চেষ্টা করবে, ভগবানের কাছে তোমার সব দুঃখ জানাবে, কাঁদবে, অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করবে তোমার সব দোষ ক্রুটি দূর করে দিতে। অপরকে শোধরাতে যাওয়া বৃথা, পাগলামি, নিজেকেই শোধরাতে হয়। কারও উপর দ্বেষভাব রাখবে না। আপনি ভাল তো জগৎ ভাল। এ যদি না পার তো সে তোমার দোষ ও তার ফলও নিজেকে ভুগতে হয়। তা হতে কেউ তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

৯১। বিষয়ের বা কারও প্রতি আসক্তি ও মমত্ববুদ্ধিই সমস্ত সংসারবন্ধনের মূল কারণ। জ্ঞানী লোক কাউকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসেন না এবং অপরকেও তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসতে বা আসক্ত হতে দিতে চান না। নিজে মুক্ত বলে তিনি কাউকে তাঁর প্রতি মায়ায় বদ্ধ হতে দিতে চান না। তিনি নিজের আত্মাকে, ভগবানকে সকলের মধ্যে দর্শন করেন বলে সর্বজীবে সমভাবে তাঁর ভালবাসা বা প্রেম। তাঁর প্রেমে দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ নেই, কামগন্ধ নেই, রূপজ মোহ নেই। জ্ঞানীই প্রকৃত প্রেমিক, প্রকৃত প্রেমিকই জ্ঞানী।

৯২। ত্যাগ, প্রেম ও পবিত্রতা ভগবান লাভের উপায়। এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ, একটি হলে অপর দুটিও থাকে। সমস্ত বিষয়-বাসনায় বিতৃষ্ণা, সর্বজীবে ভালবাসা, আপনবোধ, এবং অন্তরে বাহিরে কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হলে প্রেমস্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না। অন্তরে পবিত্র চিন্তার ধারা যাতে একটানা বয় সে বিষয়ে সর্বদা যত্ন করলে কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি সব দূরে পালায়, চরিত্র মন এমনি গড়ে যায় যে তার দ্বারা কোন কুকর্ম, কুচিন্তা, দ্বেষ, হিংসা সম্ভব হয় না। এ রকম লোকের ভেতর থেকে এমন তেজ বা শক্তির প্রকাশ হয় যে তাঁর সংস্রবে এসে অসাধু সাধু হয়ে যায়, মহাপাপী ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ হয়, নাস্তিক ভগবদ্ভক্ত হয়ে যায়, সংসারতাপে তাপিত ব্যক্তি শান্তির অধিকারী হয়।

৯৩। পাপ ও পারা যেমন চাপা থাকে না, প্রেম ও পবিত্রতাও সেইরকম চাপা থাকে না। অগুনকে কি কাপড় ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়? যাঁর আমি আমার বলতে কিছু নেই , আপন-পর নেই, তিনি নিজেকে যতই লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখুন না কেন, তাঁর জ্ঞানের আলোয় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হয়, তাঁর ভগবৎ প্রেমের বন্যায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়। সেই ধন্য যে এই রকম ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আশ্রয় ও কৃপালাভ করে।

৯৪। যৌবনই ধর্মসাধনার সব চেয়ে ভাল সময়। তখন যদি উঠে পড়ে লেগে যথেষ্ট অধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করা যায় তো অবশিষ্ট জীবন অনেকটা নিরাপদে, সুখে ও শান্তিতে কাটান যায়, যতই

বিপদ-আপদ আসুক না কেন, কিছুতেই বিচলিত করতে পারে না। এই সময় জীবনকে না গড়তে পারলে পরে আর হয়ে ওঠে না। এক মুহূর্তও আলস্যে বা বাজে কাজে নষ্ট করবে না। শরীর ভাল নয়, সময় পাইনে – এই রকম নানা ছুতো এসে জোটে। ও সব বাজে কথা। আহার-বিহার, নিদ্রা এবং সব কাজকর্ম যদি সংযত ও নিয়মিত ভাবে করা যায় তা হলে শরীর-মন সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে, তাদের দিয়ে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায় এবং কাজও খুব ভাল হয়, আর সময়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

৯৫। যা-তা যখন-তখন যত পারা যায় খেলে, যখনকার যা তখন তা না করলে, এবং কামাদি রিপুগুলিকে প্রশ্রয় দিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না, শরীরেও বল পাওয়া যায় না। উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলায় শরীর মনের ওপর এত অযথা বোঝা চাপা হয় যে তারা শেষে ভেঙে পড়ে, শরীরচর্চা বা ব্যায়ামও করতে নারাজ হয়। যা-তা গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে হজম করতেই শরীরের অর্ধেক শক্তি ক্ষয় হয়। আট-দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েও তা পূরণ হয় না, অবশিষ্ট শক্তিও বাজে কাজে ও গল্পে ক্ষয় হয়ে যায়। – কাজেই ধ্যানজপ করবার শক্তিও থাকে না, ইচ্ছাও হয় না। করতে বসলে হাই ওঠে ও তন্দ্রা আসে। এমন হলে তার দ্বারা কি কাজই বা হবে? ধর্মকর্মের কথা ছেড়ে দাও, কাজের মানুষও হওয়া যায় না। এই রকম করে এমন দুর্লভ মানবজীবন বৃথায় কেটে যায়, এটা কি কম আপসোসের বিষয়। যাতে দেবত্ব লাভ করা যায়, তাতে মনুষ্যত্বও লাভ যদি না হয় তাহলে আর পশুত্ব থেকে তফাত কি হল?

৯৬। কাঁচা মন নিয়ে ঘর করতে গেলে প্রবর্তক সাধককে সর্বদা সজাগ ও ত্রস্ত থাকতে হয়, যাতে মন মোহবশতঃ অজ্ঞাতসারে কোন কাম্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বদ্ধ না করে ফেলে। আর এইটি মনে রাখতে হবে যে এই প্রবর্তক অবস্থা শুধু যে সাধনভজন শুরু করবার সময়কে বুঝায় তা নয়। দশ বার বছর জপধ্যান করলেই উঁচু অবস্থার সাধক হওয়া যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টা ও আগ্রহভেদে এটা অনেক বৎসর ধরেও চলতে পারে, এমন কি জীবনভোর – যতদিন না কিছু সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়। এই অনুভূতিই হচ্ছে ধর্ম। তার আগেকার যা কিছু ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান, সে সব ধর্মরাজ্যে প্রবেশের তোড়জোড়, যোগাড়-যন্ত্র মাত্র।

৯৭। দেখা যায়, যারা প্রথম প্রথম সাধনভজন করতে, ধ্যানজপ করতে লাগে, তারা যত মনকে ইষ্টে সমাহিত বা একাগ্র করতে চেষ্টা করে, মন ততই বেঁকে বসে, আর যত ছাইপাঁশ অবান্তর বিষয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি মনে হয়, এ রকম বালাই তো আগে ছিল না, তখন যেটা ভাবতুম বেশ মন স্থির করে ভাবতে পারতুম, এখন এ রকম কেন হল? তার মানে হচ্ছে, মনের যে সব দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেই সব বাহ্য-বিষয়েই তাকে নিয়োগ করতুম, তাই তার সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। যেই সদসৎ বিচার করে তাকে অসার বাহ্য-বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে অন্তর্মুখ করতে, তাকে নিজের বশে আনতে চেষ্টা করা যায়, আমনি সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নদীকে বাঁধতে গেলে তার বেগ শতগুণ বেড়ে যায়। তবে তার সেই বেগকে, সেই শক্তিকে যদি অভীষ্ট কাজে লাগান যায় তো সহস্রগুণ ফল পাওয়া যায়।

৯৮। যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা সকল বিষয় সিদ্ধ হয়। বিফল হলে পনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। যদি চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ না হয়, মনে করবে যেরকম চেষ্টা করা উচিত ছিল সেরকম করা হয়নি। চেষ্টা সকল বিষয় সহজ ও অনায়াসসাধ্য হবে, ক্রমে ক্রমে উহা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে ও স্বভাবে পরিণত হবে।

৯৯। ভগবান বাস্তবিক কোন অভাব রাখেননি, মানুষের অভাব কেবল মনে। সুখদুঃখ, অভাব অশান্তি মনে, বাইরে নয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ।

১০০। স্বাধীনতা পরম সুখ। পরাধীনতা মহাদুঃখ। ঈশ্বরের দাসত্ব যথার্থ স্বাধীনতা। ষড়রিপুর দাসত্ব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের দাস হওয়া যায় না।

১০১। মানুষের নিজের বন্ধন নিজের হাতে, নিজের মুক্তিও নিজের হাতে। নিজেরা জেনে শুনে ক্ষ'য়ে বন্ধনে পড়ে ভুগে মরি।

১০২। তন্ত্র বলছেন,

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরভাবনম্।
প্রতিমাসু শিলাজ্ঞানং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥"

– গুরুকে মানুষবুদ্ধি করলে, ইষ্টমন্ত্রকে অক্ষরমাত্র ভাবলে, দেবদেবীর প্রতিমাকে পাথর বা

মৃত্তিকা জ্ঞান করলে মানুষ নরকে যায়। অর্থাৎ ঐ সবে ভ্রমাত্মক ও বিপরীত বুদ্ধির জন্যে এ বং শ্রদ্ধাবিশ্বাসহীনতাদোষে আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হয়ই না, বরং মানুষকে অধোগতি পেতে হয়।

১০৩। যারা সব সময় সব কাজের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ মনন ও তাঁর নাম জপ করে, তাঁকেই একমাত্র সার ও সম্বল বলে জানে, তাদের আপদবিপদের সময়ও তাঁকে ভুল হয় না। মৃত্যুকালেও তাঁর চিন্তায় তাদের রোগযন্ত্রণা ভুল হবে, সংসারে ধনজনে আসক্তি দূর হবে, তাঁর ভাবে চিত্ত তদ্গত হবে। – যাদের শেষ জন্ম তাদেরই এরকম হয়। তাঁর চিন্তা ও সান্নিধ্যের অভ্যাসের গুণে এটা স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়।

১০৪। মান ও নামী একই – এই ধারণা মনে যত দৃঢ় করবে, তাঁর আবির্ভাব, তাঁর (presence) প্রাণে প্রাণে তত অনুভব করবে।

১০৫। যেখানে কেউই কারো নয়, এমন কি অপনিও আপনার নয়, তাকেই সংসার বলে।

১০৬। যে আপনি আপনার মিত্র, যে সংসারেরও মিত্র ও সমুদয় সংসারও তার মিত্র। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন :

আত্মৈব হ্যাত্মানোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

– শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী (মুক্তির কারণ) এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু (বন্ধনের কারণ)।

১০৭। অনিত্য সংসারের যেমন সংযোগ তেমনি বিরহ, যেখানে সম্পদ সেখানেই বিপদ, যেখানে সুখ সেখানেই দুঃখ, যেখানে অর্থ সেখানেই অনর্থ, যেখানে ভোগ সেখানেই রোগ, যেখানে বিষয় সেখানেই বিবাদ। এ সব দেখে ও জেনেও লোক কি সুখে তাতে জড়িত হয়! বিষয়সেবায় যে আপাত-সুখ আছে, তাই মানুষের সর্বনাশ করে। লোকে কোটি দুঃখের পর নামমাত্র সুখ পেলেই সকল দুঃখ ভুলে যায়।

১০৮। সকল বিষয়ে পরিণাম চিন্তা করে কাজ করলে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যে ঠেকেও শেখে না, তার দুঃখ কে নিবারণ করতে পারে? যে জেগে ঘুমায় তাকে কে জাগাতে পারে? যাতে আর না আসতে হয়, বার বার এসে আবার অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়, তার উপায় করাই জীবনের সার্থকতা।

১০৯। দৈবের বা অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কোন কাজই করা চলে না এবং কোন কালেই কার্যসিদ্ধি হয় না। বরং মানুষ তাতে হীনবীর্য ও তামসিক হয়ে পড়ে এবং অধোগতি পায়। লোকে নিজের দোষে ভুল করে বা বিফল হয়, আর সব দোষ চাপায় দৈব বা অদৃষ্ট বা গ্রহের ফেরের ওপর। নিজের অসাবধানতায় হোঁচট খেয়ে বা পিছলে পড়ে গেল, আর দোষ দিলে জমিটার! সকল কাজই প্রায় নিজের সাধনার ওপর নির্ভর করে। দৈব বলে যদি কিছু থাকে যা উদ্দেশ্যলাভের পথে ব্যাঘাত স্বরূপ মনে হয়, তা হলে পুরুষকারের দ্বারা নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তাকে জয় করতে হবে। তবেই তো তুমি মানুষ। এরকম হলে দেখবে দৈবও তোমার অনুকুল হবে। দৈবই যদি একমাত্র বলবান হন তাহলে তো ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য, পরমাত্ম-শক্তি বলে কিছু থাকে না। দৈবই সব করাচ্ছে, আর তার জন্য দায়ী নই, আমি অবশের মত চালিত হচ্ছি – এ ভাব থাকলে মানুষ ক্রমশঃ জড়ত্ব পায়, কখনও উঠতে পারে না, আশা করতে পারেনা যে সে কোনও কালে মুক্ত হবে। সতরাং নিজেকে দুর্বল ভেবে ভেবে অধোগতিলাভ করে এবং পাপপঙ্কে আরও ডুবতে থাকে।

১১০। আমি অবশ হয়ে সব করছি, আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, একথা তার পক্ষেই বলা সাজে যে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে এক করতে পেরেছে। সে এক পরম ভক্তই পারে, যে পরমেশ্বর ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার পা কখনও বেতালে পড়ে না, তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হয় না। তার হৃদয় অদম্য শক্তি ও অনুপ্রেরণায় ভরা থাকে, তাতে নৈরাশ্যভাব আসে না, সে সুখে দুঃখে বিচলিত হয় না। তার 'নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ' ভাব সর্বদা থাকে। তার কাছে লাভা-লাভ, জয়-পরাজয়, মান-অপমান সব সমান হয়ে যায়।

১১১। যে কাজ যখন করতে হবে তখন উঠে পড়ে সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়ে তাতে লেগে যেতে হবে, যতই বাধা-বিঘ্ন আসুক ভ্রূক্ষেপ করবে না। তা হলে দেখবে সেই সব বাধা-বিঘ্নই প্রকারান্তরে তোমার সহায় হয়ে

দাঁড়াবে। সব সময় কি মনের মত অনুকুল আবহাওয়া পাওয়া যায়? সব কাজ সেরে, সংসারের একটা সুব্যবস্থা করে নিশ্চিন্তমনে ঈশ্বর আরাধনায় লাগবো বলে যে মনে করে, তার অবস্থা সেই নির্বোধের মতো হয়, যে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ভীষণ ঢেউ দেখে ভয় পেয়ে ভাবে, ঢেউগুলো একটু শান্ত হয়ে এলে জলে নামা যাবে। যে তীরে আমরণ বসে থাকলেও তা হয় না, তার নাওয়াও আর হয় না। সমুদ্রে ঢেউ চিরকালই থাকবে। সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউএর সঙ্গে যুঝে স্নান করে উঠে আসতে হবে। এই সংসারসমুদ্রেও সেই রকম ঢেউয়ের যুঝতে যুঝতে ভগবানের নাম নিতে হবে, তাঁর সাধন-ভজন আরাধনা করতে হভে। সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কোন কালেই আশা পূর্ণ হবে না।

১১২। অনেকে কাজকর্ম যোগাড় করতে না পেরে সংসারে নিত্য অভাব-অনটনে ও নানা অশান্তিতে ভুগে পদে পদে সব কাজে বিফলমনোরথ হয়ে, সংসারের দায়িত্ব এড়াতে মঠের সন্ন্যাসী হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। আজকাল সন্ন্যাসী হওয়া যেন এ কটা সখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হওয়া, সন্ন্যাসী হওয়া কি সহজ কথা! সংসারে থেকে সাধন-ভজন করে বিষয়ে অনাসক্তি, নির্লিপ্ত বা নিঃস্বার্থ ভাব কতকটা অভ্যাস করে যোগ্যতা লাভ করতে হয়, জমি তৈরি করে নিতে হয়। নইলে নবানুরাগের উচ্ছ্বাস তালপাতার আগুনের মতো কিছুকাল পরে নিবে যায়, আর কুড়েমিতে দিন কাটে, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, মানযশের দিকে ঝোঁক হয়। তখন জপধ্যান করা বেগার খাটর মতো – এক আধ ঘন্টা বসে সেরে নেয়। আজ শরীর ভাল নেই, কাল অন্য কাজের দরুন সময় পাইনি, এই রকম একটা না একটা ছুতো এসে যোগায়। প্রায় দেখা যায়, সংসার ত্যাগ করে বাধাবিঘ্নের হাত এড়িয়ে, স্বচ্ছন্দে থেকে মনে করে, যা চেয়েছিলুম তা তো পেলুম, এ খন আর ব্যস্ত হবার কিছু নেই, ধীরে সুস্থে ভগবানের নাম নিলেই হবে। সুতরাং সে তেজ, সে রোক আর থাকে না। ক্রমশঃ মন নিম্নগামী হয়।

১১৩। বাইরে থেকে লোকে মনে করে মঠের সাধুরা কেমন মজায় আছে – গঙ্গার ধারে এমন সুন্দর স্থান, বাড়ি-ঘর মন্দির, টাকার অভাব নেই, কেমন ভাল খায় দায় থাকে, ভাবনা চিন্তা নেই, ঠাকুরের কাজকর্ম সময়মত একটু করলে, নিজের ভাবে ইচ্ছামত একটু পড়াশুনা বা জপধ্যান করলে, বাকি সময় গল্পফুর্তি করে কাটায়। কেমন সুখের স্বাধীন জীবন! তারা জানে না মঠের সাধুদের দিনরাত কত খাটতে হয়, কত কঠোর নিয়ম-কানুনের ভিতর থাকতে হয়, কত রকমের কঠিন সেবার কাজ করতে হয়, শরীর-প্রাণ তুচ্ছ করে আতুর বিপন্নদের উদ্ধারের জন্য কত বিপজ্জনক কাজে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয় – নিজের ভক্তি-মুক্তি পর্যন্ত তুচ্ছ করে নারায়ণ-জ্ঞানে জীবসেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হয়। যে সংঘের নির্দেশ পালন করে না বা একটা ছুতো করে ফাঁকি দিয়ে থাকতে চায় বা সরে পড়ে, নিজের খামখেয়ালে চলে সে তলিয়ে যায়, তার উন্নতির পথ বন্ধ হয় এবং ক্রমশঃ অধোগতি হয়।

১১৪। আদর্শভ্রষ্ট সাধুর চেয়ে শ্রদ্ধা ও আগ্রহবান্ সংসারী ভক্ত বেশী সাধনভজন করতে না পারলেও সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ সে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য-অনুযায়ী যথাসাধ্য উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, দুর্বিষহ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে ভগবানের কাছে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করছে তার অন্তরে ত্যগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে সংসারের নানা কর্তব্যের দায়িত্ব ও বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুঝতে থাকে। তার প্রাণ আঁকুপাঁকু করে, প্রাণে ব্যাকুলতা আসে, বন্ধন ভেঙ্গে সংসার ত্যাগ করে ভগবান লাভ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়। তাতে শক্তিসঞ্চয় হয়। ভগবান তার সহায় হন। তিনি অন্তর্যামী, তার অবস্থা বোঝেন। তার প্রতিবন্ধকগুলি ক্রমশঃ সরিয়ে দেন। আসল কথা, অন্তর থেকে ত্যাগ না হলে ভক্তি, মুক্তি, জ্ঞান কিছুই লাভ হয় না।

১১৫। অনেকে মনে করে সেবা কর্ম, এ সব করে কি হবে? তার চেয়ে দিনরাত সাধনভজন করে আগে ভগবান লাভের চেষ্টা করা যাক। তাও কি হয়! কিছুদিন করলেই বুঝতে পারবে যে কার্যতঃ তা সম্ভব নয়। কর্ম, পরহিতের জন্যে কর্ম না করলে চিত্তশুদ্ধি হবে কি করে? মন নির্মল না হলে কি স্থির শান্ত হয়? আর তা না হলে কি ধ্যান সহজে হয়? কর্ম করবার সময়েই ঠিক ঠিক আপনার পরীক্ষা হয়, নিজের মুরদ কত জানা যায়। মনে কত কি গলদ আছে, বিষয়-বাসনার দিকে কতটা টান বা আসক্তি আছে, স্বার্থপরতা কতটা আছে, সহ্যগুণ কিরকম আছে, এ

গুলো ক্রমশঃ বাড়ছে কি কমছে – এ সকল জানবার উপায় একমাত্র কর্ম, এবং কর্মের ভিতর দিয়েই তার প্রতিকার সহজ। সদসদ্বিচার, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মপরীক্ষার ভাব থাকলে মন ক্রমশঃ নির্মল ও নিষ্কাম হয়, অহংভাব নাশ হয়, হৃদয়ে প্রেম আসে। তখন আর কর্মে কর্মবোধ থাকে না, কর্ম বন্ধনের হেতু না হয়ে মুক্তির হেতু হয়। অর্থাৎ কর্মই তখন পূজা হয়ে দাঁড়ায়, কর্মে ও ঈশ্বরের উপাসনায় – নারায়ণ-জ্ঞানে জীবসেবায় ও ভক্তিতে প্রভেদ বোধ থাকে না। সেই হল ঠিক ভক্তি। আর তা লাভ করবার স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে কর্মযোগ।

১১৬। আবার পরাভক্তি জ্ঞানলাভ না হলে হয় না। অর্থাৎ আমার ইষ্ট পরমেশ্বর সর্বভূতে সর্বজীবের মধ্যে রয়েছেন, জীব-জগৎ তা থেকে ভিন্নসত্তা নয়, এটি উপলব্ধি করা অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে জীব-জগৎ ও অন্তরাত্মার একাত্মবোধই পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান। তবে অধিকারীভেদে এ দুয়ের পথ ও সাধন ভিন্ন। জ্ঞানের অধিকারী জগতে বিরল, পথও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই ভাল।

১১৭। জ্ঞানমার্গে গোড়া থেকেই সমস্ত অস্বীকার করতে হয় – নেতি, নেতি – আমি এ নই, ও নই; যা কিছু দেখছি শুনছি, অনুভব করছি, কিছুই আমি নই । আমি দেহ নই, নন নই, ইন্দ্রিয় নই, আমার রোগশোক, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ জ্ঞান নেই। জগৎপ্রপঞ্চ সর্বৈব অসৎ, অর্থাৎ ত্রিকালে – ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানে – এর অস্তিত্ব নেই। আমি আখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা, এ কমেবাদ্বিতীয়ম্। দেহাদি উপাধিবিশিষ্ট জীবের পক্ষে এরকম সাধন কি কখন সম্ভব হয়! কাঁটা ফুটছে, আগুনে পুড়ছি, তবুও কোন যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে না। এ হচ্ছে বিষয়সম্পর্কবর্জিত ত্যাগী সাধকের চরম অবস্থা, যা সমস্ত সাধন ও সিদ্ধির শেষ নির্বিকল্প সমাধিতেই উপলব্ধ হয়। ঠাকুর বলতেন, সে অবস্থায় একুশ দিনের বেশী শরীর থাকে না।

১১৮। ভক্তিমার্গ এইজন্যে সকলের পক্ষে সহজসাধ্য যে এতে ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি ও বাসনাগুলোকে নাশ করতে হয় না, শুধু সেগুলোর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়, অর্থাৎ তাদের গতি বা ঝোঁক ও শক্তিগুলো অন্যদিকে ধীর ভাবে চালিত করতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি যেগুলো অশেষ ক্লেশ ও বন্ধনের কারণ, যাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে বারে বারে জন্মমৃত্যু ভোগ হয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অনন্তকালেও হয় না, তাদের বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবলে আমূল দোষ দর্শন করে বীতস্পৃহ হয়ে, মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো থেকে উঠিয়ে নিয়ে ভগবদভিমুখী করলে তারা যে শুধু নিবীর্য হয় তা নয়, তাদের সেই অদম্য অধোগামী বৃত্তিগুলো ঊর্ধ্বগামী হয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী হয় ও অফুরন্ত পরম আনন্দরসে জীবকে প্লাবিত করে। যদি সুখের কামনা কর তো প্রেমময় ভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করবার জন্য লালায়িত হও, লোভ করতে হলে পরম অক্ষয় ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা কর, যদি মোহগ্রস্ত হতে হয় তো চিরসুন্দরের প্রেমে মজে থাক, যদি ক্রোধ করতে হয় তো তাঁর উপর রাগ কর – কেন তিনি দেখা দিচ্ছেন না। এই রকম মদ ও মাৎসর্য বিষয়েও, যা তোমাকে তুচ্ছ বিষয়ে আবদ্ধ রাখে।

১১৯। প্রথম প্রথম কর্মও চাই, সাধনভজনও চাই। দুই-ই করতে হবে। দুয়েরই উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, মনে এই দৃঢ় ধারণা রাখবে। আদর্শ ঠিক না রাখলে নানা উপসর্গ এসে জোটে ও কর্মেতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, সবেতেই তাই। সেইজন্যে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, সদসৎ বিচার করতে হবে, প্রার্থনাশীল হতে হবে। তা হলে ঈশ্বরের কৃপায় এমন অবস্থা আসবে যখন সাধনভজন ও কর্মে কোন তফাৎ বোধ থাকবে না, তখন সবই সাধনভজন হয়ে দাঁড়াবে। তবে কর্মীদের মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য বৈরাগ্য-ভাব অবলম্বন করে তীর্থভ্রমণ, নির্জন সাধনভজন ও তপস্যা করে দরকার। তাতে শরীর-মন সতেজ ও প্রফুল্ল হয়, আত্মপ্রত্যয় ও ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে, শক্তিসঞ্চয় ও পূর্ণভাবে চরিত্রগঠন হয়।

১২০। নিজ ইষ্টের পূজা দীক্ষিতমাত্রেই করতে পারে। দীক্ষা নিলে দেহ শুদ্ধ হয়। তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁকে আপনার জেনে খুব ভক্তিভাবে পূজা করবে। পূজায় মন বসলে মন সহজে স্থির হবে, ধ্যান জমবে, আনন্দ পাবে। তাঁকে মনের মতো করে ফুল চন্দন ও মালা দিয়ে সাজাবে। ভক্তির পূজায় কোন বিধি নিষেধ নেই, তন্ত্র মন্ত্র মুদ্রা যন্ত্রাদির দরকার নেই। চাই কেবল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা। পূজার সময় মনে করবে তোমার ইষ্ট সত্য সত্যই তোমার

পুষ্পাঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ও নিবেদিত দ্রব্যাদি সাদরে গ্রহণ করছেন, তা যতই সামান্য জিনিস হোক না কেন। ভক্তিমাখা আহার্য তাঁর কাছে বড় মিষ্টি। তিনি দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বিদুরের শাকান্ন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলেন। যা কিছু নিজে খাবে তা মনে মনে তাঁকে নিবেদন করে খাবে, জানবে সেগুলি তাঁরই দয়ার দান, প্রসাদ। তাতে দ্রব্যদোষ কেটে যায়।

১২১। সেবা, স্বাধ্যায়, সাধন, সত্য ও সংযম – এ ই পঞ্চ 'স'কার উপাসনা সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সতত সযতনে সাধ্যমত ঐগুলির অনুষ্ঠান করবে।

১২২। পূজা, সেবা, জপ, ধ্যান প্রভৃতি নিত্যকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠান করলে পূর্ব ও ইহজন্মের অশুভ সংস্কারের নাশ হয় ও শুভ সংস্কারের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। তার ফলে সাধন ভজন ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়, এবং চিত্ত শুদ্ধ মন স্থির হয়ে ভগবদ্ভাবে মগ্ন হয় ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

১২৩। পূর্বজন্মের কিছু সৎসংস্কারবা সুকৃতি না থাকলে ধর্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মতিগতি হয় না। কোন বিশেষ পূণ্যফলে যদিই বা হয় তো এত বাধাবিঘ্ন এসে জোটে যে সে সব ঠেলে ফেলে ধর্মপথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন। তা বলে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাদের অতিক্রম করতে যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে ততই তারা পথ ছেড়ে পালাবে, আবার হয়তো তারাই শত্রুতা ছেড়ে তোমার অনুকুল ও সাহায্যকারী হবে। বাধাবিঘ্নকে যত ভয় করবে, ততই তারা আরো ভয় দেখাবে, জোর করবে ও তোমায় পেয়ে বসবে।

১২৪। পূর্বজন্মের ভাল সংস্কার না থাকলে শাস্ত্র ও গুরুপদেশ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বিদ্যাদুদ্ধিতে বা অন্য কোন বিষয়ে কেউ হয়তো খুব উন্নত হতে পারে সমাজে উচ্চপদ ও মান-সম্ভ্রম লাভ করতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব মাথা খাটিয়ে তার প্রসার করতে পারে ও কোটিপতি হতে পারে, কিন্তু ধর্ম বা সূক্ষ্ম পরমার্থতত্ত্ব-বিষয়ে সে হয়তো এ কেবারেই অজ্ঞ বা ছেলেমানুষ, সামান্য বিষয়ও সহজে বুঝতে পারে না। তবে সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বাসী, সরল ও হৃদয়বান্ হলে ঈশ্বরকৃপায় সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হয়। তার ফলে সে ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

১২৫। শুভসংস্কার বেশী না থাকলেও চেষ্টা, আগ্রহ ও অভ্যাসের গুণে অনুকুল সংস্কার জন্মায়। অভ্যাসের মধ্যে মহাশক্তি আছে। অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সঙ্গে করলে দৃঢ় হয়। যা অভ্যাস করবে তাই পরে স্বভাব হয়ে দাঁড়াবে। তখন জোর করে করতে হয় না, আপনিই হয়ে যায়। ভগবানের স্মরণ, মনন, প্রার্থনা, জপধ্যান অভ্যাস করলে অন্য কাজে লেগে থাকলেও ভেতর থাকে তা আপনা আপনিই হতে থাকে। কম্পাসের কাঁটর মত মন সেইমুখো হয়ে থাকে, বিষয়ে আসক্তি দূর হয়, বিপদে আপদে তাকে বিচলিত করতে পারে না। অন্তিম কালেও মন শান্ত ও তাতেই মগ্ন থাকে। তাকে আর বার বার জন্মমৃত্যু ভোগ করতে হয় না, দেহান্তে সে পরমপদে লীন হয়ে যায়।

১২৬। বিবেক, বৈরাগ্য ও অনুরাগের সঙ্গে ঐকান্তিক ভাবে সাধনভজন করে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, তাঁকে অন্তরে বাইরে সর্বত্র সকল বস্তুতে দর্শন ও উপলব্ধি করতে পারবে। তখন আর অন্য কিছু লাভ করবার, আকাঙ্খা করবার থাকে না, জীব আনন্দময় হয়ে যায়। এই হল মানবজীবন-ধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সব মনের ভ্রান্তিমাত্র।

১২৭। প্রাণভরে যত পার জপ তপ করবে। তবে হৃদয়ে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে রাখবে যে, এত জপ তপ করছি বলেই ভগবান দেখা দেবেন, কৃপা করবেন, তা নয়, তাঁকে লাভ করা কেবল তাঁর কৃপাতেই হয়। * সাধনভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্যে। পাখীর ডানা বেদনা হলেই বসবার ইচ্ছা হয়। সমুদ্রের মাঝে বার বার আকাশে উড়ে উড়ে মাস্তুল ছাড়া বিশ্রাম করবার আর কোন স্থান নেই দেখে পাখীকে সেই মাস্তুলেই আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু এ বোধটি নিশ্চয় না হলে অনন্যশরণ হওয়া যায় না।

১২৮। ভক্ত কখনও ভগবানের সঙ্গে বিকিকিনির (বেচাকেনার) ভাব রাখে না। সে জানে তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু – তিনি নিজগুণে, স্বভাবগুণে কৃপা করবেনই, তবে সাধনভজন যথাশক্তি করতে হয়, করে কিন্তু শেষে এই বিশ্বাসেই আসতে হয় যে, এসব কিছুই কিছুর নয়। তাই সাধক গেয়েছেন –

"নিজগুণে যদি রাখ, করুণানয়নে দেখ, নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।" সাঙ্গা মানে বিবাহ। ভূতের আবার বে কি? কখনও হয়নি, হবে না। সাধনভজন করে কেউ তাঁকে কখনও পায় নি – পাবে না। সাধক জানে সধনভজন করে তাঁকে পাওয়ার আশা "সন্তরণে সিন্ধুগমন"।

১২৯। তবে কি সাধনভজন ছেড়ে দিয়ে তাঁর যখন কৃপা হবে তখন পাব বলে বসে থাকতে হবে? যে তৃষ্ণায় কাতর, যার মন তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুল, সে কি হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? তার অবস্থা যে – "আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।" সাধকের কাছে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। সে জানে ভগবান অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন, তিনি ছুঁচের মধ্য দিয়ে উট ঢুকুতে পারেন, বার করতে পারেন।

১৩০। যথার্থ ভক্তের ভাব, সাধকের ভাব হচ্ছে – আমি জপধ্যান করে আনন্দ পাই, না করে থাকতে পারি না, তাই করি; প্রাণ জুড়োবার আর যে অন্য উপায় নেই, তাই করি; জপধ্যান যে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, না নিলে যে প্রাণে বাঁচি না, তাই করি। তিনি যে আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। তাঁকে পেতেই হবে, যে রকম করেই হোক। না পেলে যে পাগল হয়ে যাব, প্রাণ যাবে, এ জীবনই বৃথা হবে। এরকম ব্যাকুলতা, এরকম রোক হলে তিনি কৃপা করবেনই। তিনি যে দয়াময়। তাঁকে মনঃপ্রাণ এক করে ডাকলে, তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলে, অনন্যশরণ হলে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন।

১৩১। তবে সে ব্যাকুলতা, সে অনন্যশরণ ভাব কি সহজে আসে? জন্মজন্মান্তর ধরে সাধনভজন করলে সাধকের শেষ জন্মেই তা হয়। নাগমশায়ের জীবনেই এটি সর্বাবস্থায় জ্বলন্তভাবে দেখ গিয়েছিল। সর্বদা কি এক অপূর্ব নেশায় বিভোর – দেহজ্ঞানশূন্য তন্ময় ভাব! কি আশ্চর্য দীনতা, কি উৎকট ব্যাকুলতা! যে না দেখেছে সে ধারণা করতে পারে না। অদ্ভুত জীবন! অদ্ভুত আদর্শ!

১৩২। মন স্থির না হলে এবং শুদ্ধ ও নির্মল না হলে ভগবদ্দর্শন হয় না। পুকুরের জল স্থির ও স্বচ্ছ না হলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না বা অস্পষ্ট দেখায়। আরশিতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না বা ঝাপসা দেখায়। সেইজন্যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যই এ কমাত্র উপায় বা সাধন। অভ্যাসের গুণে যা কঠিন ও দুর্লভ বোধ হয় তাও সহজ হয়ে যায়। যা নিয়ত অভ্যাস করবে তাই স্বভাব হয়ে দাঁড়াবে। আর বৈরাগ্য চাই। সমস্তই অনিত্য ও অসার, ভগবানই এ কমাত্র সার ও নিত্য, এইটি জেনে একমাত্র তাঁতেই পূর্ণভাবে মন প্রাণ অর্পন করতে পারলে হৃদয়ে প্রেমের উদয় হবে। তাহলে আর বাকি রইল কি? "স ঈশঃ অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপঃ।" হৃদয়ে যখন সেই বাক্যমনের অতীত প্রেম ঘনীভূত হয়ে জমাট বাঁধবে, তখন তাই প্রেমঘন প্রেমময় রূপে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

১৩৩। যাই আয় হোক না কেন, তা থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু জমাবার চেষ্টা করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, গৃহীর পক্ষে সঞ্চয় খুব দরকার, ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগে। কারণ স্বাস্থ্য, চাকরি বা ব্যবসা অথবা ধনজন কিছুই স্থায়ী নয়। যৌবনে ও প্রৌঢ়ে আহারে, বিহারে, লৌকিকতায়, বৃথা আড়ম্বরে, অসৎসঙ্গ প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের বশে ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগে বিমূঢ় হয়ে ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা না করে যথা আয় তথা ব্যয় বা আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করলে পরে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। সংসারে অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, ভাবনা-চিন্তা লেগেই থাকে। বুড়ো বয়সে জরা-ব্যধি আক্রমণ করে, কর্মশক্তিও দিন দিন ক্ষীণ হয়। তখন কিছু গচ্ছিত থাকলে আতান্তরে পড়তে হয় না, হা-হুতাশ করতে হয় না, মনের সুখে স্বাধীনভাবে ভগবৎ-চিন্তায় জীবন কাটানো যায়।

১৩৪। "যখন যে ভাবে মা গো রাখিবে আমারে
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।"

তিনি মঙ্গলময়, সর্বান্তযামী; তিনি জানেন কার পক্ষে কি ভাল, এবং এমনভাবে ব্যবস্থা করেন যা তোমার পক্ষে ও সকলের পক্ষে ভাল। একজনের ভাল করতে গিয়ে তিনি তো অন্য সকলের মন্দ করতে পারেন না। আমরা 'আমার আমার' করে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে নিজের ও আমাদের স্বজনদের সুখটুকু মাত্র চাই, তাতে পরের যা হয় হোক গে। সংসারে দুঃখটুকু বাদ দিয়ে খাঁটি সুখ বলে কোন জিনিস নেই, দুয়ে এমন মিশে আছে যে

একটি চাইলে অপরটিও এসে যায়। তাই নিজে মনোমত যা হয় একটা চেয়ে বসে গোল করে ফেলি বই তো নয়। তোমার আমার কিসে যথার্থ মঙ্গল হবে তা তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানেন, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাই তাঁর উপর সমস্ত ভার দিয়ে, তিনি যা বিধান করেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে জীবনযাপন করলে সুখদুঃখ বিচলিত করতে পারে না।

১৩৫। বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥
হিতোপদেশ, ৪-র্থ অধ্যায়, সন্ধি।

"যাঁর মনে বিষয়াসক্তি আছে, তাঁর পক্ষে বনে গেলেও সেখানে নানা দোষের উৎপত্তি হয়। আর যিনি শুভকর্মে প্রবৃত্ত, তিনি ঘরে থেকেও পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ করলে তাই তাঁর তপস্যা। আসক্তিশূন্য ব্যক্তির গৃহই তপোবন।" অর্থাৎ এই মন নিয়ে যেখানেই যাবে, যা করবে রেহাই পাবে না – ভুগতে হবে। আবার নতুন নতুন রকমের বন্ধনেও জড়িয়ে পড়বে। আর যে সংসারে থেকেও সাধনভজন করে মনকে বশে আনতে পারে, বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়, তার পক্ষে ঘর ও বন দুই-ই সমান। সে যেখানেই থাকুক, যাই করুক না কেন, সে নিত্যযুক্ত আনন্দময়।

১৩৬। সাধারণ লোক কথা না কয়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। যদি কথা কইবার কাউকে না পায় তো মনে মনেই কথা কইবে। চিন্তা করা আর কি? আপনা আপনি কথা কওয়া। তাই যদি হল তো মিছে আজেবাজে যা-তা না বকে ভগবানের নাম করা, চিন্তা করা কি ভাল নয়? কাজকর্মের ব্যাপারে অবশ্য লোকের সঙ্গে নানা কথা কইতে হয়। কিন্তু যখন এ কলা থাকবে, বা বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকবে না, তখন মিছে অন্য ভাবনা না ভেবে ভগবানের স্মরণমনন ও নাম করাই তো ভাল। অন্য ভাবনা না আসে তার জন্য জপ-অভ্যাস দরকার। জপ কিনা নিরবচ্ছিন্ন, একটানা ভগবানের নাম করে যাওয়া।

১৩৭। জপের সময় নাম-নামী অভেদ ভেবে তাঁরই চিন্তা করতে হয়। যে নাম সেই নামী, অর্থাৎ নাম করলেই যাঁর নাম তাঁকেই বোঝায়। কোন কাজের জন্য যদি কাউকে নাম ধরে ডাক তো সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্তিটাও মনের সামনে ভেসে ওঠে এবং সেও সাড়া দেয় বা আসে। জপও ঠিক তাই, যদি ঠিক হয়, যদি তাঁতেই মন লেগে থাকে। আর এইটুকু বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমার ডাক তাঁর কাছে পৌঁছুচ্ছে, তাঁর সাড়া পাবই। প্রার্থনা-সম্বন্ধেও তাই, যদি উহা অন্তর থেকে আসে। অভ্যাস করতে করতে এ ভাব পাকা হয়, মন তদ্গত হয় এবং তাঁর সান্নিধ্য প্রাণে প্রাণে অনুভূত হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, "জপাৎ সিদ্ধি।"

১৩৮। যোগীরা বলেন, শরীরের মধ্যে সাতটি পদ্ম বা নাড়ীচক্র আছে। গুহ্যদেশে মূলাধার চতুর্দল, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান ষড়্দল। নাভিতে মণিপুর শতদল, হৃদয়ে অনাহত দ্বাদশদল, কণ্ঠে বিশুদ্ধ ষোড়শদল, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা দ্বিদল, এবং মস্তকে সহস্রার সহস্রদল পদ্ম আছে। আর মেরুদণ্ডের বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী আছে। ঐ সুষুম্না নাড়ী মূলাধার থেকে যথাক্রমে ছটি পদ্ম ভেদ করে ব্রহ্মস্থানে সহস্রদলে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু সুষুম্নার রাস্তা বন্ধ থাকে যতক্ষণ না কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয়। কুলকুণ্ডলিনী আত্মার জ্ঞানশক্তি, চৈতন্যরূপিণী, ব্রহ্মময়ী। তিনি সকল জীবের মধ্যে মূলাধার পদ্মে ঘুমন্ত সাপের মতো যেন নির্জীবভাবে রয়েছেন – যেন ঘুমুচ্ছেন। তিনি যোগ, ধ্যান, সাধনভজনাদির দ্বারা জাগ্রত হন। মূলাধারে সেই শক্তি যখন জেগে উঠে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রদলে পরমশিব বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন, তখন উভয়ের সংযোগ থেকে যে পরমামৃত ক্ষরণ হয়, তা পান করে জীব সমাধিস্থ হয়। তখনই জীবের চৈতন্য হয়, আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয়। তখন জ্যোতিদর্শন, ইষ্টমূর্তি দর্শন প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি সব হয়ে থাকে। গুরু ও পরমেশ্বরের কৃপায় সাধকের সুকৃতিবলে কখন কখন তিনি আপনা হতেই অথবা অল্প আয়াসে জেগে থাকেন। সেই নির্বিকল্প সমাধি-অবস্থায়, ঠাকুর বলতেন, সাধারণতঃ একুশ দিনের বেশী শরীর থাকে না, জীব পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। এই হল সংক্ষেপে ষট্চক্রভেদ।

১৩৯। তবে যাঁরা জগদ্গুরু আচার্যকোটি বা

ঈশ্বরকোটি, যাঁরা জগতের হিতের জন্য কোন বিশেষ ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য দেহধারণ করেন, তাঁরা ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ করে জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঐ পথ দিয়ে সহস্রার (মস্তক) হ'তে অনাহতচক্রে (হৃদয়ে) নামিয়ে এনে "ভাবমুখে" থাকেন, অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত পরামার্থিক (absolute) ও ব্যবহারিক (relative) জ্ঞানের মধ্যে ওঠানামা করে থাকেন ও হাজার হাজার জীবকে অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করেন।

১৪০। স্বামিজী বলেছেন, যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধান ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়েও কৃচিৎ কখন কোন কোন মহাপুরুষের কুণ্ডলিনীশক্তি আপনা আপনি জাগ্রত হয়ে ওঠে - হঠাৎ সত্যলাভের মতো। যেমন, পথে চলতে চলতে কোন লোক হোঁচট খেয়ে দেখলে যে একখানা পাথর সরে গেছে ও তার নীচে কি যেন ঝকঝক করছে। পাথরখানা উঠিয়ে দেখলে নীচে ঘড়া ঘড়া মোহর রয়েছে - সেইরকম। কিন্তু তাঁরা যেমন জগতের হিত করেন, তেমনি তাঁদের মনের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির দ্বারা জগতের অহিতও করে থাকেন। উচ্চৈঃস্বরে সমবেতভাতে নাম-সংকীর্তনাদির সময় অনেকে ভাবের উচ্ছ্বাসে কাঁদতে কাঁদতে ও নাচতে নাচতে সংজ্ঞাহীন হয়। তাঁদেরও কুণ্ডলিনীশক্তি ক্ষণেকের জন্যে কতকটা জেগে ওঠে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া ভয়ানক হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাদের কু-অভ্যাস চরিতার্থ করবার ইচ্ছা, বা নিজেকে লোকের কাছে ভক্ত ও ধার্মিক বলে জাহির করে মানযশ লাভ করবার বাসনা খুব প্রবল হয় ও শেষে তারা কপটাচারী, ভণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

১৪১। সূর্যের আলোতেই যেমন লোকে সূর্যকে দেখে, প্রদীপ জ্বেলে নয়, তেমনি ভগবানের কৃপাতেই তাঁর দর্শনলাভ হয়, মানুষের ক্ষুদ্রশক্তিতে নয়। তবে, মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেললে আর দেখা যায় না। তেমনই অবিদ্যা বা মায়া ভগবানকে দেখতে দেয় না। সাধনভজন, প্রার্থানাদির ঝড়ে সেই মেঘকে উড়িয়ে দেয় ও তিনি প্রকাশিত হন। সাধনভজন তাঁর দর্শনের হেতু নয়, কারণ তিনি স্বপ্রকাশ। তারা কেবল আবরণ, বাধাবিঘ্ন মোচন করে।

১৪২। জ্ঞান, ভক্তি, পবিত্রতা, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা - এসব ঈশ্বরীয় ভাব, তাঁর নিজস্ব ঐশ্বর্য। তিনি যাকে কৃপা করতে, দেখা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে আগে থেকে ঐসব দিয়ে ভূষিত করেন। তখন বোঝা যায়, মোহরাত্রি গতপ্রায়, অরুণোদয়ের আর দেরী নেই। ঠাকুরের সেই উক্তি জান তো? প্রজার কাতর প্রার্থনায় জমিদার তার বাড়িতে যেতে রাজী হলেন ও তাঁর ব্যবহার্য কিছু আসবাবপত্র প্রজার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ সে গরীব মানুষ, ওসব বহুমূল্য জিনিস পাবে কোথা? ভগবান তাকেই কৃপা করেন যে তাঁর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে ব্যাকুল অন্তরে তাঁকে চায়।

১৪৩। তবে ভগবানের কি প্রিয় অপ্রিয় আছে ? যে সংসারে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও বিষয় নিয়ে তাঁকে ভুলে থাকে, তাকে কি তিনি কৃপা করেন না, তার উপর কি তিনি অসন্তুষ্ট? তা কেন হবে? ভক্ত অভক্ত, সন্ন্যাসী গৃহী, সকলেই যে তাঁর সন্তান। ছেলে যখন মাকে ভুলে খেলায় মত্ত থাকে তখনও তার উপর মার যেমন স্নেহভালবাসা থাকে, সে যখন খেলা ফেলে দিয়ে 'মা মা' বলে কাঁদে আর মা সব কাজ ছেড়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর করে, তখনও সেই সমান ভালবাসা। মা ভাবে, ছেলে যতক্ষণ খেলায় ভুলে আছে, সুখ পাচ্ছে, বেশ তো থাকুক না। যখন খেলা আর ভাল লাগবে না, খেলা ফেলে মাকেই চাইবে, কিছুতেই মানবে না, তখন মা তাকে কোলে নেয়। তবে মায়ের কোলে ছেলের যে সুখ তা কি আর খেলায় হয়? কিন্তু তবু খেলতে ছাড়ে না। একেই মায়া বলে।

১৪৪। যতই মেঘগর্জন বা ঝড়-বৃষ্টি হোক, বিদ্যুৎ চমকাক, বা বজ্রপাত হোক, চাতক পাখী তাতে ভয় না পেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে মনের সাধে বারি পান করে পিপাসা নিবারণ করে। নীচের জলাশয়ের জল সে কিছুতেই খাবে না, তা তৃষ্ণায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হোক না কেন। সেইরকম ভগবানের একান্ত ভক্ত তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে একমাত্র ভগবানের দিকেই চায়ে থাকে, ভগবান ছাড়া আর কিছুই বা কারও প্রত্যাশা রাখে না। সে জানে যা কিছু সবই তাঁর কৃপার দান। সে যতই তাঁর রুদ্র মুখ দেখুক না কেন, সংসারে যতই দুঃখ-কষ্ট, অভাব-দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ হোক না কেন, সে কিছুতেই বিচলিত হয় না। সে জানে, ভগবান মঙ্গলময়, যা করেন তা তার নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্যই করেন। তাতে সন্তুষ্ট না হওয়ার মানে তাঁর খুঁত-ধরা,

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। ভক্ত প্রাণ গেলেও তা করতে পারে না।

১৪৫। ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে যিনি শান্তির পথে, ভগবানের দিকে নিয়ে যান তিনিই গুরু। গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক পারমার্থিক পিতা-পুত্রভাব। ঐহিক পিতা জন্ম দেন। গুরু শিষ্যকে পরমপদ দেখিয়ে জন্মমরণ থেকে উদ্ধার করেন। পিতৃঋণ বংশরক্ষা শ্রাদ্ধাদির দ্বারা শোধ করা যায়। কিন্তু গুরু অবিদ্যা থেকে উদ্ধার করেন বলে তাঁর ঋণ শোধ করা যায় না - সর্বস্ব অর্পণ করেও না। যেমন বংশপরম্পরাক্রমে পিতৃপুরুষদের কিছু না কিছু গুণ পুত্রপৌত্রাদিতে বর্তায়, তেমনি গুরুপরম্পরায় কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ভাব শিষ্য-প্রশিষ্যে অর্সায়।

১৪৬। ব্যস্ত হলে বস্তুলাভ হয় না। পরমাত্মাই এ কমাত্র বস্তু, সার, সত্য, আর সমস্তই – সংসারপ্রপঞ্চ – অবস্তু, অসার, প্রতারণাময়, সুতরাং হেয়, এই জ্ঞান পাকা হওয়া চাই।

১৪৭। তখনই 'তুমি' যথার্থ থাকবে যখন 'তুমি' থাকবে না। তখনই তোমার যথার্থ জীবন শুরু হবে যখন 'তোমার' মরণ হবে। "আমি মলে ঘুচয়ে জঞ্জাল।"

১৪৮। আমরাই সংসারটার উপর যেন আমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে ভেবে প্রাণপণে নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্যে যত হাঙ্গাম বাধাই – নিজেরাও অশান্তি ভোগ করি, পরেরও ক্ষতি বা সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হই না। দিনরাত ছুটোছুটি, লুটোপুটি, কাটকুটি করে মরি। লোকে যেমন বলে, "আমার মরবারও সময় নেই।" এমনি মহামায়ার মায়া! মা বসে বসে খেলা দেখেন ও হাসেন। যেমন বেড়ালছানা বা কুকুরছানাগুলো খেলা করে, কামড়াকামড়ি করে, একটু আধটু দাঁতও বসিয়ে দেয়। আমরা খেলাটার উপর আজথা গুরুত্ব আরোপ করি ও নিজেদের তার সঙ্গে এমনি গুলিয়ে জড়িয়ে ফেলি যে, মরি বাঁচি জ্ঞান থাকে না। তাতে খেলাট বেশ জমে বটে। যেমন নট ও নটীরা তাদের ভূমিকার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে অভিনয় করলে সেটা সত্যিকার বলে মনে হয় – কিন্তু সেটা সাময়িক।

১৪৯। জগৎটাকে, জীবনটাকে খেলা বলে ধারণা হলে খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়। স্বপ্ন দেখছি, কত হাসছি, কত কাঁদছি, বিষম বিপদে পড়ে অকূলে ভাসছি, ভয়ে গোঁ গোঁ করছি, চীৎকার করে উঠছি। তখন বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, এমন কি উদ্ভট ব্যাপারগুলোও স্বাভাবিক ও সত্যি বলে মনে হয়। কিন্তু যেই ঘুম ভাঙলো, স্বপ্ন বলে মনে হল, অমনি স্বপ্ন ভেঙে যায়। তখন লোকে প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবে, "ওঃ বাঁচলুম, এ তো স্বপ্ন দেখছিলুম।" আবার হয়তো সুস্বপ্ন দেখলুম, লটারিতে দু লাখ টাকা পেয়েছি, আমোদে আটখানা হয়েছি, হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল, হতাশায় মুষড়ে গেলুম। আমাদের জীবনটাও তেমনি দীর্ঘ একটানা স্বপ্ন বই তো নয়। দুঃস্বপ্ন-সুস্বপ্ন, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের টানাপোড়েন মাত্র। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছি ততক্ষণ সব কিছু সত্যি বলে মনে করছি। স্বপ্ন ভাঙ লে জগৎসংসার কোথায় উড়ে যায়! তখন নিত্য-সত্য স্বরূপ মাত্র বিদ্যমান থাকে।

১৫০। ভগবান কারু উপর রাগ করবেন কেন? অভীষ্টলাভে কেউ ব্যঘাত করলেই ক্রোধ হয়। তাঁর কি কোন অভিষ্ট, প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য আছে, আর কে বা তাঁকে বাধা হিচ্ছে বা দিতে পারে? তিনি আমাদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করেন না। আমরা তাঁকে ডাকি বা ভুলে থাকি, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তাতে আমাদেরই লাভ বা ক্ষতি, সুখ বা দুঃখ, মঙ্গল বা অমঙ্গল।

১৫১। উপনিষৎ বলছেন, যে জানে যে সে ব্রহ্মকে জানে সে কিছুই জানে না। যে জানে তিনি অবাঙ্মনসগোচর, পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানাতীত, সেই তাঁকে ঠিক ঠিক জানে। তখন সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। জ্ঞাতাকে কে জানতে পারে? জানলে জ্ঞাতা যে জ্ঞেয় হয়ে গেল, সীমাবিশিষ্ট হয়ে গেল। যা কিছু সীমাবিশিষ্ট, যা কিছু দেশকাল-নিমিত্তের অধীন, যার কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, তার উৎপত্তি বিনাশ আছে, দোষ-গুণ আছে, তা কখনও মুক্তি বা পূর্ণতা দিতে পারে না। সুতরাং তা জেনে বা উপাসনা করে বা পেয়ে লাভ কি?

১৫২। ব্রহ্ম (ঈশ্বর) সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। এগুলি তাঁর গুণ নয়, তাঁর সত্তা। গুণ বস্তুকে সীমাবিশিষ্ট করে; গুণ নিত্য নয়, কারণ গুণের ক্ষয়বৃদ্ধি আছে। তাই তিনি গুণাতীত, সর্বাতীত। তাঁর

সম্বন্ধে 'নেতি, নেতি' মাত্র বলা যায়। তাঁর পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি হলে তাও বলা যায় না, কারণ তখন দ্বৈতভাব লোপ পায়। তখন কে বলবে? কিন্তু সাকাররূপে তিনি অনন্ত গুণের আধার।

১৫৩। ব্রহ্ম যদি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হন, তবে তাঁতে মায়া কোথা থেকে এল এবং কেন এল? – এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। কারণ এ প্রশ্নের উত্তর মায়ার ভিতরে থেকে কখনই পাওয়া যায় না। আর মায়ার বাইরে চলে গেলে তখন কেই বা এ প্রশ্ন করবে? তার কাছে তখন মায়া বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব থাকে না। তখন দ্রষ্টা, দৃশ্য নাশ হয়ে এ কত্বমাত্রের অনুভব হয়। অর্থাৎ, সে তখন উপলব্ধি করে যে একমাত্র ব্রহ্ম ত্রিকালে (ভূত ভবিষ্যত বর্তমানে) সমভাবে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁতে কখনও মায়া স্পর্শ করেনি, দ্বৈতবোধ ভ্রমমাত্র, আর আমিই সেই ব্রহ্ম।

১৫৪। যে গুরুর উপদেশে অকপট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে সেগুলি যথাযথভাবে প্রাণপণে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করে ও গুরুর প্রীতির জন্য তাঁর সেবাদিপরায়ণ হয়, সেই শিষ্য। গুরুকে সামান্য মানুষ মনে করবে না, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসলে ও ভক্তি করলে ধর্মপথে দ্রুত উন্নতি ও সিদ্ধিলাভ হয়। সদ্গুরুই হৃদয়স্থিত পরমগুরুর (ইষ্টের) সঙ্গে মিলন করে দেন। তাঁর মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক ধারা শিষ্যে প্রবাহিত হয়। এমন কি, গুরুকৃপায় সমস্ত অভীষ্টই লাভ হয়। কিন্তু শিষ্যকেও সেইরকম উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও অদম্য অধ্যবসায় চাই। গুরুরও শাস্ত্রমর্মজ্ঞ, পাপশূন্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া চাই। তিনি ভোগেচ্ছাশূন্য, নিঃস্বার্থ ও পরহিতব্রত হবেন, সর্বজীবে তাঁর দয়া ও প্রেম সমভাবে থাকবে।

১৫৫। পিতা ও গুরু পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ আমার ছেলে, আমার শিষ্য আমার চেয়েও খুব বড় হোক, উন্নত হোক, মানসম্ভ্রম লাভ করুক অন্তর থেকে এই রকম ইচ্ছা করেন। বাপ বরং ছেলের কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক বিষয়ে আশা রাখেন, গুরু কিন্তু শিষ্যের কাছ থেকে নিজের জন্যে কিছুই প্রত্যাশা করেন না। তাঁর কাজ, তাঁর স্বভাব হচ্ছে কেবল দিয়ে যাওয়া। স্বামীজী আমাদের বলতেন, "তোরা এক একজন বিবেকানন্দের চেয়ে বড় হয়ে যা দেখি। তাহলে আমি খুব সুখী হই, আর আমার আসা সার্থক মনে করি।"

১৫৬। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে তার কিছুই লাগে না। শরীরটাকে যদি শব করা যায়, অর্থাৎ দেহে আত্মবোধ যদি নাশ করা যায়, তা হলে সংসারের যতই তীব্র আঘাত তার উপর পড়ুক না কেন, তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই রকম লোকই নির্বিকার জীবন্মুক্ত। তার কাছে সংসার আর শ্মশান দুই সমান।

১৫৭। এই শরীরের প্রতি আসক্তিই – দেহাত্মবুদ্ধিই – যত অনর্থের মূল। এই থেকেই যত ভয় ভুলচুক ও অধর্মের উৎপত্তি হয়। শরীররক্ষার জন্যে, প্রাণধারণের জন্যে এমন পাপ নেই যা লোকে করে না – চুরি, জুয়াচুরি, লোকের সর্বনাশ ও হত্যা পর্যন্ত। কামিনীকাঞ্চনই তার একমাত্র উপাস্য দেবতা হয়। ফলে,সুখের আশায় সে কেবল দুঃখই বরণ করে, দেহরক্ষার আশায় সে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে। প্রতিমুহূর্তেই তার মৃত্যুভয়। কিন্তু যে মহাপুরুষ দেহবুদ্ধি ত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনি এ কটা সামান্য জানোয়ারের জন্যেও অকাতরে নিজের জীবন দিরে প্রস্তুত হন। দেহটা তো তাঁর কাছে কিছুই নয়, অতি তুচ্ছ জিনিস। মানুষ দুই শ্রেণীর, পশু-মানব ও দেব-মানব – দেহী ও বিদেহ। দেহবদ্ধ জীব পশু-মানব, বিদেহ পুরুষ দেব-মানব।

১৫৮। সমস্ত কর্মের ফলফল ভগবানকে অর্পণ করতে হয় – ভাল, মন্দ, সব। পূণ্যাদি ভাল কর্মগুলি নিজে করেছি বলে গৌরব মনে করলুম, আর তার ফলগুলি নিজের সুখভোগের জন্যে রাখলুম, পাপাদি মন্দকর্মগুলি, যাতে দুঃখভোগ হবে সেগুলি তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে, তিনি যেমন করিয়েছেন তেমনি করেছি বলে সেগুলির ফল তাঁকে দিলুম, তাঁকে দায়ী করলুম, তা নয়। যে নিজের জন্যে কিছু না রেখে, নিজের জন্যে না ভেবে ভগবানকে সব দেয়, তিনিও তাকে সব দেন।

১৫৯। যে শব্দ বা নাম অবিদ্যা থেকে মনকে ত্রাণ করে তাকেই মন্ত্র বলে।

১৬০। পাতঞ্জল দর্শনে অবিদ্যার সংজ্ঞা এই রকম আছে – অনিত্যে অর্থাৎ সংসারে নিত্যত্ববোধ, অশুচিতে (শরীরাদিতে) শুচিজ্ঞান, দুঃখে (অর্থাৎ দুঃখময় বিষয়-ভোগাদিতে) সুখবুদ্ধি অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদি যারা কেউই আপনার নয় তাদের আপনার বলে ধারণা। অবিদ্যা অনাদি, অর্থাৎ কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তা নির্ণয় করা যায় না, এবং জগদ্ব্যাপার হিসাবে তার নিবৃত্তি নেই; প্রলয়কালেও তা বীজরূপে থাকে ও আবার সৃষ্টির সময় আবির্ভূত হয়। জ্ঞানলাভ না করা পর্যন্ত মানুষ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে নিজ নিজ ভাব ও কর্ম অনুসারে মনুষ্য অথবা পশুপক্ষী প্রভৃতি যোনিতে নানা দুঃখ ভোগ করে।

১৬১। তবে কি মুক্তির চেষ্টা করা বৃথা? না, কারণ অবিদ্যা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সান্ত, অর্থাৎ যখন অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয় ও জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তখন তাঁর কৃপায় জ্ঞানলাভ হলে অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয়। তাই পরম কারুণিক ভগবান গীতায় বার বার বলেছেন, "ঐই অনিত্য দুঃখময় সংসারে এসে একমাত্র আমারই ভজনা কর, আমার শরণ লও। আমি তোমায় সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, তোমায় দুস্তর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারসাগর পার করে আনন্দধামে নিয়ে যাব।

১৬২। আজকাল যত সব হয়েছে – "এনে দাও বসে মারি, তোর বাপের পূণ্যে নড়তে নারি'র দল, কেউ খাটতে চায় না, ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে তারা চায়, অত চেষ্টাচরিত্র করা আমার পোষাবে না, সব তুমি যদি করে দাও তবেই হয়! দিন কতক বা কয়েক মাস এক আধ ঘন্টা চোখ বুজে বসে অনুযোগ করে, "আমার কিছু হচ্ছে না, মন স্থির করতে পারি না, কিছুই উন্নতি বোধ করছি না", ইত্যাদি। স্বামিজী বলতেন, "ভগবান শাক, ভাত, মাছ নাকি – পয়সা ফেললে, কিনে নিলে!" আশু ফলের দিকে অত নজর কেন? কাজ করে যাও, কালে ফল আপনিই ফলবে। সংসারের লোকের জন্যে খাটলে তারা মজুরি দেয়, আর ভগবানের জন্য খাটলে তিনি দেবেন না? বিশ্বাস, নিষ্ঠা, অনুরাগ চাই, ধৈর্য চাই। অধ্যবসায় চাই। বীজ বুনতে না বুনতেই কি গাছ হয়ে ফল ধরে? তার পেছনে কত খাটতে হয়, লেগে থাকতে হয়, তবে তো যথাসময়ে ফসল পাওয়া যায়।

১৬৩। দেখা যায় অনেকে দীক্ষা নেবার পর, কিছুদিন খুব মন দিয়ে জপধ্যান করে ও বেশ আনন্দ পায়। তারপর সে ভাবটা ক্রমশঃ বা হঠাৎ চলে যায়, আর কিছুতেই বসতে ভাল লাগে না, হৃদয়টা যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়, নিজেকে অবলম্বনশূন্য অসহায় বলে মনে হয়। তাতে ভয় পাবার বা নিরাশ হবার কিছু নেই। সকল জিনিসেরই ওঠা-নামা, জোয়ার-ভাঁটা আছে, মিলন ও বিরহ আছে। সাধকের মনকে আশা-নিরাশায়, আলো-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে। যার অন্তরে ভগবান বা ধর্মলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তার ওরকম হলে ব্যাকুলতা বাড়ে, সে কাতর হয়ে কাঁদে, কৃপা ভিক্ষা করে, স্থির থাকতে পারে না। তখন তাঁর কৃপায় সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে লেগে যায় এবং আগের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে যায় ও আনন্দ পায়।

১৬৪। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের নবানুরাগ ক্রমে ক্রমে মিইয়ে যায়; মনের সে তেজ ও বল থাকে না, ধর্মকর্ম গতানুগতিক হয়ে দাঁড়ায়, দিনগত পাপক্ষয়ের মতো বা বেগারের মতো, বা নিয়মরক্ষার মতো তারা ওগুলো করে যায় বছরের পর বছর। অথবা এ পাটই উঠিয়ে দেয়। সংসারের নানা কাজকর্ম সময়াভাবে বা শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতির অজুহাত দিয়ে মনকে প্রবঞ্চনা করে। এ রকম হলে বুঝতে হবে যে তারা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশে, বা সংসারে বিশেষ কোন ধাক্কা খেয়ে বা শোক পেয়ে ক্ষণিক ধর্মভাব বা বৈরাগ্যের প্রেরণায়, অথবা বিশেষ কোন স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় দীক্ষা নিয়েছিল, বা সংসার ত্যাগ করেছিল। তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না।

১৬৫। অনেকে বলে, "গুরু যখন দীক্ষা দিয়েছেন, তিনি আমার সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করেছেন, আমার আর করবার বা ভাববার কিছু নেই, তাঁর কৃপাতেই সব হবে।" পাপের ভার দেওয়া বা নেওয়া তারা যত সহজ মনে করে তা নয়। তা হলে আর ভাবনা কি ছিল, সকলেই অনায়াসে নিষ্পাপ হয়ে যেত। পাপের ভার গুরুকে বা ভগবানকে দিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে পূণ্যের ভারও দিতে হয়। খালি দুঃখভোগের অংশটি দিলুম আর সুখভোগের অংশটি নিজের জন্যে রাখলুম তা হলে তোমারও ঠিক ঠিক দেওয়া হয় না, তাঁরও নেওয়া হয় না। আর পাপের

ভার দিয়ে কেউ যখন নিষ্পাপ হয় তখন তার পক্ষে আর কোন পাপ কাজ করাও সম্ভব হয় না। যদি পরেও মনে আগের মতো পাপ বা কুপ্রবৃত্তি থাকে, যদি দীক্ষা দিয়ে নবজীবন লাভ না হয় তাহলে বুঝতে হবে, দীক্ষার সময় সেই পাপগুলো - ঠাকুরের সেই রহস্যোক্তিতে — গঙ্গাস্নান করবার সময় যেমন তফাতে গিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে, গঙ্গায় নেয়ে উঠে এলেই আবার ঝুপ করে ঘাড়ে চাপে, তেমনই করে আর কি!

১৬৬। আর এক কথা। গুরুর উপর যদি বিন্দুমাত্র ভালবাসা, শ্রাদ্ধাভক্তি থাকে তাহলে নিজের যত ময়লা আবর্জনাগুলি তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করাতে কি প্রাণ চাইবে? গুরু কি ময়লা ফেলার গাড়ি না কি? যাদের সে ভালবাসা-ভক্তি নেই, যারা ঘোর বিষয়ী স্বার্থপর, তাদেরই এ ইরকম হীনবুদ্ধি হয়। তারা তো শিষ্য বলেই গণ্য হবার উপযুক্ত নয়। আর যাদের গুরুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভালবাসা আছে তারা সেই ভয়ে আর পাপ কাজ করতে পারে না, পাছে গুরুকে ভুগতে হয়। হাঁ, এ ইরকম শিষ্যের পাপের ভার তিনি নেন। বস্তুতঃ ভগবানই গুরুরূপে তার ভার গ্রহণ করেন ও তাকে উদ্ধার করেন।

১৬৭। তবে শিষ্যের কিছু পাপ গুরুতে আসে এটা ঠিক। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, নির্বিচারে অনেককে মন্ত্রদীক্ষা দিলে সদ্গুরুর নিষ্পাপ শরীরে কঠিন রোগ আশ্রয় করে তাঁর আয়ুক্ষয় করে। স্বার্থশূন্য পরম কারুণিক সদ্গুরু জেনেশুনে পরের হিতের জন্যে, তাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার প্রেরণায় নিজের শরীরের জন্য ভাবেন না, শিষ্যদের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন তিলে তিলে দান করেন। অবতাররা অন্যের পাপের ভার নেন, তাঁদেরও সেইজন্য রোগ-ভোগ করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "গিরিশের পাপ নিয়ে আমার শরীরে এই ব্যাধি (চানচরে — গলায় ক্ষতরোগ)।"

১৬৮। শরীর তো তুচ্ছ কথা, সদ্গুরু যে নিজের আজীবন কঠোর তপস্যালব্ধ অমূল্য পারমার্থিক ধনও শিষ্যকে অকাতরে, প্রতিদানের আশা না করে, নিঃশেষে দান করেন। শিষ্য যদি শুদ্ধসত্ত্ব ও যথার্থ ভগবৎপ্রেমী হয় তাহলেই গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারে। অথবা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে গুরুপদিষ্ট সাধন পথে শিষ্য যত অগ্রসর হয়, ও তার চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই সে গুরুশক্তির খেলা ও তাঁর কৃপা হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারে। গুরুকৃপা ও শিষ্যের অক্লান্ত চেষ্টার সমাবেশে সিদ্ধিলাভ হয়।

১৬৯। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, কখনও ভুলবে না। পশুদের মতো আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়সুখের চেষ্টায়, আর গল্প-গুজব, পরচর্চা ও বাজে কাজে আয়ুক্ষয় করলে তোমার জীবন বৃথা যাবে ও অশেষে দুঃখভোগই সার হবে। যতদিন পর্যন্ত তোমার শরীরে ও মনে বলবীর্য আছে, সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ভগবানকে লাভ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগো। কিছুতেই চেষ্টায় ঢিলেমি করবে না। পরে করা যাবে, বা ভগবানের যখন ইচ্ছা বা কৃপা হবে তখনই সম্ভব হবে — এ সব অকেজো কুঁড়েদেরই কথা — যাদের কিছু করবার আন্তরিক ইচ্ছা নেই, তাদের কোনকালে কিছু হবে না।

১৭০। ষোল থেকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্তই জীবনের সব চেয়ে ভাল সময় যখন শরীরে পূর্ণ ক্রিয়াশক্তি থাকে এবং মনে উৎসাহ, উদ্যম, সাহস, আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি অভীষ্টলাভের উপযোগী গুণগুলি আপনা থেকেই বিদ্যমান থাকে। তুমি কি মনে কর, জীবনের এই অমূল্য সময়টা বৃথা কাজে নষ্ট করে বুড়ো বয়সে সাধন-ভজনে মন দেবে? বৃথা আশা! এটা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তখন যদিও মনে ইচ্ছা থাকে, দেখবে শরীর বইবে না, নানা দুরারোগ্য ব্যধিতে ঘিরবে, রোগযন্ত্রণায় অস্থির হবে, সামান্য এ কটু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়বে, আলস্য ও তন্দ্রা আসবে। তখন ব্যর্থ, অসহায়, পরমুখাপেক্ষী জীবন আসহনীয় হবে। আর শরীরও যদিই বা কতকটা সবল থাকে তবু সমস্ত জীবনের সংস্কার ও অভ্যাস এবং স্ত্রীপুত্রপৌত্রাদির ওপর মায়া এমন দৃঢ়ভাবে তোমাকে আবদ্ধ করে রাখবে যে, ভগবানের চিন্তা ও আন্তরিক ও তাঁকে পাবার জন্যে আন্তরিক চেষ্টায় মন বসবেও না, তাকে জোর করে বসাতেও পারবে না। তা ছাড়া জীবন তো আজ আছে কাল নেই, এই আছে এই নেই; কে বলতে পারে, তুমি বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাঁচবে ও তখন অবসর পাবে? যা করবার এখুনি করে নাও, কালকের জন্যে রাখলে সে 'কাল' আর কোন কালেই আসবে না।

১৭১। সাধকজীবনে এই কটি গুণ ও নিয়ম অভ্যাস করা একান্ত দরকার – (১) ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর, (২) ব্রহ্মচর্যপালন – ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অর্থাৎ কামসঙ্কল্প-ত্যাগ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অসারতা ও দোষ চিন্তা করে তাতে অনাসক্ত ও বিতৃষ্ণ হবে, বৈরাগ্যবান্ হবে। বীর্যধারণ ছাড়া শরীর মন ও বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য ঠিক ঠিক পালন করলে মেধা বলে একটি সূক্ষ্ম নাড়ীর সৃষ্টি হয়, যা থেকে ধারণাশক্তি ও সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করবার শক্তির স্ফুরণ হয়। তখন স্বাস্থ্য অটুট হয়, দেহে ও মুহে দিব্যকান্তি, মনে অদম্য তেজ আসে। ক্রিয়াশক্তি ও প্রতিভা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক গুণ বেশী হয়। (৩) আহারে-বিহারে সংযম ও নিয়মবর্তিতা। খাদ্য অনুত্তেজক, বলকারী, সহজপাচ্য হওয়া চাই। লোভ ত্যাগ করতে হবে। আহারের উদ্দেশ্য রসনাপরিতৃপ্ত করা নয়, শরীরকে সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখা। মুক্ত বায়ু সেবন ও লঘু ব্যায়ামের অভ্যাস হিতকর। ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল, নিদ্রালু, অলস ও যথেচ্ছাচারী লোকের দ্বারা কোন কাজই হয় না, মহৎ কাজ তো দূরের কথা। (৪) কুসঙ্গ, অসৎপ্রসঙ্গ, পরচর্চা, বাজে কাজে সময় নষ্ট করা – এইগুলি এ ড়িয়ে চলবে। সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, সৎচিন্তা, সদসৎ বিচার করবে। (৫) জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে এবং তার সিদ্ধির জন্যে কায়মনোবাক্যে যত্ন করবে। অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনভজন করবে, কিছুতেই মনে নৈরাশ্য বা অবসাদ আসতে দেবে না। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে, ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে, ভগবানকে একমাত্র আপনার ও সর্বস্ব জেনে তাঁকে মনঃপ্রাণ দিয়ে ভজনা করলে পরম আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হবে।

১৭২। সাধকের সারা জীবনটাই একটানা সাধনা বিশেষ, – প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় দু-এক ঘন্টা জপতপ সেরে বাকি সময়টা বিষয়কর্মে ডুবে থাকা নয়। তাতে কখনও জীবনগঠন হয় না। ধর্মভাব যখন জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায় ও অবস্থায় ফুটে উঠে, যখন সেটা মজ্জাগত হয়ে যায়, তখনই লোককে ধার্মিক বলা যায়। হাতে কাজ কর, মুখে পাঁচ জনের সঙ্গে কাজের বিষয়ে কথাবার্তা কও, কিন্তু মন ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখ, জেনো যে আসল হচ্ছে শেষেরটি – যার জন্যে শরীরধারণ ও আর সব কিছু। নিরভিমান, স্বার্থত্যাগ, নির্লিপ্ততা এবং ভগবানই এ কমাত্র সার ও সত্য এই জ্ঞানই হচ্ছে এর উপায়। শক্ত বটে, তবে অভ্যাস করতে করতে ক্রমশঃ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন চিঁড়ে কোটার দৃষ্টান্ত দিতেন। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে চিঁড়ে কোটবার সময় হয়তো ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে দেনা-পাওনার বা জিনিসের দর করছে, কিন্তু মনটা আছে ঢেঁকির মুষলের দিকে, সেটা যেন হাতের ওপর না পড়ে যায়।

১৭৩। প্রথম প্রথম নিয়ম করে জপধ্যান করতে হয়। মন স্বভাবতঃ কাজ করতে, খাটতে নারাজ, কেবল ছুতো খোঁজে না করবার অথবা ফাঁকি দেবার। যে কাজে তাকে লাগাতে চাও তা না করে অন্যদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াবে। কিছু কাজে না লাগালে কত কুকাজ বা বাজে কাজ করবে। কথায় বলে, "আলস মন শয়তানের কারখানা।" খুব সত্যি কথা। তাকে বশকরতে হলে জোর করে নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে হবে। ভেবে চিনতে এমন একটা 'রুটিন' (কার্যক্রম) করবে যা রক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত হবে। আর দৃঢ় সঙ্কল্প রাখবে যে, যে অবস্থাতেই পড় না কেন, অন্য যে কাজই আসুক না কেন, যে নিয়ম বেঁধেছ তা যে করেই হোক পালন করবে। এই রকম নিষ্ঠা ও জোর চাই। আহারবিহার, পড়াশুনা, ব্যায়াম, নিদ্রা, কাজকর্ম, ধ্যানভজন, এমন কি আমোদ-আহ্লাদ, খেলাধূলা – সব কাজের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকবে। এলোমেলোভাবে দিন কাটালে বৃথা জীবন নষ্ট হবে। 'রুটিন' করে মনকে দৃঢ়ভাবে শাসিয়ে বলবে, "ওহে বাপু, তুমি চাও বা না চাও, তোমাকে এই সব নিয়ম মেনে চলতেই হবে।" কিছুদিন মন বেঁকে বসবে, কিছুতেই বাগ মানতে চাইবে না, এ দিকে সেদিকে পালিয়ে যাবে। তুমি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না, তাকে জোর করে ধরে এনে কাজে লাগাবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বোঝাবে। হিংস্র জন্তুকে বশ করা আর মনকে বশ করা একই রকম। অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি চাই। সে যখন দেখবে বাবা, কিছুতেই ছাড়ান ছিড়েন নেই, তখন নিজের ভিরকুটি ছাড়বে, ভালমানুষটি হয়ে যা বলবে তাই করবে। একে বল অভ্যাসযোগ। এছাড়া মনকে বশ করবার আর অন্য কোন উপায় নেই জানবে।

১৭৪। ওষুধ গেলার মতো এই রকম অভ্যাসযোগ যদি তিন চার বৎসর ক্রমাগত করতে পারো - হাজার শক্ত, শুকনো ও আলুনী লাগুক না কেন – তখন

দেখবে ধ্যানভজন ব্যাপারটি কি মিষ্টি, যেন অমৃতের মতো, এবং বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক। কলেজের এক এ কটা পরীক্ষা পাস হলে ছাত্রদের রাত জেগে, দেহ পাত করে, স্বাস্থ্য খুইয়ে কি ভীষণ খাটতে হয়! তার উপর ভয় ভাবনা ও দুশ্চিন্তা তো আছেই; যেন এক একটা ফাঁড়া কাটনো – যেন জীবনমরণ পাস করবার ওপর নির্ভর করছে! আর এ সব কি জন্যে করা, না – বড় চাকরি পাব, টাকা উপার্জন করবো, মানযশ হবে, সুখে থাকবো, এই সব অনিশ্চিত আশায়। ভগবান লাভ করা এর চেয়ে এক হিসেবে সোজা, এইভাবে যে এতে অমন ভয় ভাবনা ও দুশ্চিন্তার অবসর নেই। কারণ, সাধনায় সিদ্ধি অনিবার্য। ভগবানকে পাবার জন্যে যদি কেউ অন্য সব কাজ ছেড়ে, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন," এই পণ করে উঠে পড়ে একরোখা হয়ে লাগে তো তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন, ও এমন অমূল্যধনে ধনী করেন যার কাছে জগতের সমস্ত ধনসম্পদ, সুখ ও বিলাসের দ্রব্যাদি তুচ্ছ হয়ে যায়। সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্বের অধিকারী হয়।

১৭৫। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন, "দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন জপধ্যান করে চেলারা যখন এসে আমায় বলে, 'কই কিছু তো হচ্ছে না, মনকে কিছুতেই বশ করতে পারি না, মোটে শান্তি বা আনন্দ পাই না,' তখন আমি কোন উত্তরই দিই না, তাদের কথা কানেই শুনি না। তার পর দু-তিন বৎসর পরে তারা আপনিই বলে, 'এতদিনে কিছু উন্নতি হচ্ছে মনে হয়, কিছু আনন্দ ও শান্তি পাচ্ছি।' সেইজন্য আমি তোমাদের বলি, দু-তিন বৎসর এ কটানা উঠে পড়ে অবিরাম সাধনভজন করে যাও, তখন আনন্দ পাবে। তোমরা কিছু করবে না, ফাঁকি দিয়ে সিদ্ধপুরুষ হতে চাও! একি পাগলামি নাকি?"

১৭৬। শ্রীশ্রীমাও ছেলেদের অত্যাচারে জ্বালাতন হতেন। বলতেন, "তখনকার (ঠাকুরের সময়ে) কত সব কেমন ভক্ত ছিল। এখন যারা আসছে, কেবল বলে, 'বাবাকে দেখিয়ে দাও', 'ঠাকুরকে দেখিয়ে দাও', 'তাঁর দর্শন কেন পাই না?' 'আপনি মনে করলেই করে দিতে পারেন।' কত যোগী ঋষি যুগযুগান্তর তপস্যা করে পেলে না, আর ওদের ফস করে সব হয়ে যাবে! সাধন নেই, ভজন নেই, তপস্যা নেই, এখনই দেখিয়ে দাও! কত জন্মে কত কি করে এসেছে; সে সব ক্রমে ক্রমে কাটবে তবে তো! এ জন্মে না হয় পরজন্মে হবে, কি তারও পরের জন্মে হবে। তবে চেষ্টা করলে কখনো হবেই হবে। ভগবান লাভ কি এতই সোজা গো! তবে এবার ঠাকুরের সোজা পথ, এই যা। সংসার করছ, বছর বছর ছেলেমেয়েদের বাপ হচ্ছে, বলে কি না, ঠাকুরের দেখা কেন পাই না! ঠাকুরের কাছে মেয়েমানুষেরা যেতো, বলতো 'কেন ঈশ্বরে মন হয় না? মনস্থির হয় না?' – এই সব। ঠাকুর তাদের বলতেন, 'আরে, গা থেকে এখনও আঁতুড়-গন্ধ যায়নি। আগে আঁতুড়-গন্ধ ছাড়ুক। এখন কি গো! ক্রমে হবে। এ জন্মে এই দেখাটেখা হল, পরজন্মে তখন হবে।' স্বপ্নে-টপ্নে হয়তো দর্শন হয়। ঠাকুরকে এখন চাক্ষুষ দেখা, তিনি দেহ ধরে দেখা দেবেন, সে ক'জনের হয়? সে বহু ভাগ্যের কথা।"

১৭৭। ঠাকুর বলতেন, "আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোদের এক ট্যাং করলেই হবে।" ভগবান লাভের জন্যে ঠাকুর যে অলৌকিক তীব্র সাধনা করেছিলেন, তার শতাংশও মানুষের পক্ষে করা সাধ্যাতীত। তবু তিনি যে এক ট্যাংও করতে বলেছেন সেটা তো করা চাই। ষোল ট্যাং করতে চেষ্টা করলে তবে যদি এক ট্যাং হয়। ভগবানের দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। বাকিটা তিনিই করিয়ে নেন। সেইটিই তাঁর কৃপা।

১৭৮। "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" – ঠিক কথা। কিন্তু খালি কথায় বললে হয় না, অথবা কেবল জীবহত্যাত্যাগ, অর্থাৎ মাছ মাংস না খেলেই অহিংসা হয় না। সে অহিংসা ঠিক ঠিক তখন হয় যখন সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন অর্থাৎ আত্মানুভূতি হয়। জীবনধারণ মানেই প্রতিমুহূর্তে জান্তে বা অজান্তে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট অসংখ্য প্রাণীর জীবননাশ বা ক্ষতি। যোগীরা দুধ খেয়ে তপস্যা করেন অতি সাত্ত্বিক আহার বলে। কিন্তু দুধের জন্যে বেচারী বাছুরকে যা তার প্রাপ্য সেই স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। এটা কি হিংসার বা নিষ্ঠুরতার কাজ নয়? তবে জ্ঞানতঃ যতই হিংসা বা পরের অনিষ্ট না করে থাকা যায় ততই ভাল। অহিংসা অভ্যাস করলে সর্বভূতে প্রেম হয়, ক্ষুদ্র অহং বা স্বার্থবুদ্ধি দূর হয়, শত্রুমিত্রে অভেদ-জ্ঞান হয়; সুতরাং চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয়, এ বং এরূপ শুদ্ধ মনে ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি হয়।

১৭৯। ঠাকুর বলেছেন, "ধ্যান করবে কোণে, বনে,

মনে।" তাতে মন সহজে একাগ্র হয়। কোণে অর্থাৎ অন্তরালে, একান্তে। ধর্মকর্ম, জপধ্যান গোপনে করতে হয়। বেশী জানাজানি হলে নানা বাধাবিঘ্নের উৎপত্তি হয়। নিজের ভাব গোপন রাখতে হয়, ভাবের অঙ্কুর হতে না হতে উচ্ছ্বাস বা বাহিরে প্রকাশে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। নিজের ভাবভক্তি যত অন্তরে লুকিয়ে রাখা যায় তত পাকা হয়, বৃদ্ধি পায়, শক্তিশালী হয়। সাত্ত্বিক সাধক তাই একলা অন্ধকারে, বা গভীর রাত্রে, বা মশারির ভেতরে ধ্যানজপ করে, যাতে কেউ জানতে না পারে।

১৮০। "বনে" অর্থাৎ লোকের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানে – যেমন হিমালয় পর্বতে, বা গঙ্গাদি পূণ্যতোয়া নদীতীরে, অথবা স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র আবহাওয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে। এইরূপ স্থানই যোগীরা সাধনের অনুকূল বলে বেছে নেন, যেখানে প্রলোভনের, কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব নেই। বনে গিয়েও যদি সংসারের ভাবনা ভাবা যায় তাহলে সে আর বন রইল না, সংসারই সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হল। মনকে স্থির ও একাগ্র করতে পারলে বাইরের কিছুতেই তাকে চঞ্চল করতে পারে না। এ ইরূপ যোগীর কাছে এই সংসারটাও বন হয়ে যায়। হাটের গোলমালের মধ্যেও তিনি বনের নীরবতা অনুভব করেন।

১৮১। "মনে" ধ্যানই আসল কথা। যেখানেই ধ্যান কর না কেন মনে অর্থাৎ হৃদয়ে, অন্তরের অন্তরে, ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁতেই সমস্ত মন বা অহংবোধ একাগ্র করবার জন্যে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে। এই রকম নিরন্তর চেষ্টা করতে করতে অন্তরে মহাশক্তির স্ফুরণ হয়, যার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। মন যত নানাদিকে ছড়িয়ে থাকে তত তার শক্তির হ্রাস হয়, মন দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তার দ্বারা কোন মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না।

১৮২। ধ্যান চোখ বুজে অন্ধকারে করবে। জানালা খোলা রাখবে, ঘরে বায়ুবদ্ধ না হয়। কাপড় জামা ঢিলে রাখবে। ঠাকুর তার কোন কোন ত্যাগী ভক্তকে নেংটো হয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন – শিশুভাব ও বন্ধনমুক্তভাব আনবার জন্যে।

১৮৩। ধ্যানের সময় ইষ্টের অধিষ্ঠান হৃদয়কে যে ভাবে যার ভাবতে ভাল লাগে সেই ভাবে সে ভাবতে পারে। যেমন হৃদয়-আসন, হৃদয়-কমল, হৃদয়-কন্দর (গুহা), হৃদয়-মন্দির, হৃদয়াকাশ, হৃদয়-কোষ, হৃদয়-কেন্দ্র, হৃদয়-নিকেতন, হৃদয়-কুটীর, হৃদয়-কুঞ্জ, হৃদয়-সিংহাসন, আরও যত রকমের কল্পনা ভক্তের মনে উদয় হতে পারে। হৃদয় মানে অন্তরের অন্তরতম স্থান, যেখানে প্রিয়তমকে রাখতে প্রাণ চায়। হৃদয়ে ধ্যান করতে না পারলে প্রথম প্রথম ইষ্টকে পটে বা মূর্তিতে সামনে রেখেও ধ্যান করা যায়, কিন্তু সেটা বাহ্য।

১৮৪। ধ্যানের প্রশস্ত সময় – (১) দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ অর্থাৎ ঠিক ভোরবেলায় ও সন্ধ্যায়; (২) ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষভাগে, সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেক পূর্বে; (৩) গভীর রাত্রে। এই সব সময়ে প্রকৃতি স্থির, শান্ত ও গম্ভীর থাকে। আর এই সব সময়ে সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের ভেতরে যে সুষুম্না নাড়ী আছে সেটি কার্যকারী হয় এবং তার ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দুই নাক দিয়ে হয়। সাধারণতঃ তার দুদিকে যে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী আছে তাদের এ কটির ক্রিয়া হয় এবং ডান নাক অথবা বাঁ নাক দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বয়, তাইতে মনকে চঞ্চল করে। অনেক যোগী সেইজন্য লক্ষ্য রাখেন, কখন সুষুম্নার ক্রিয়া হচ্ছে, এবং বুঝতে পারলেই অন্য সকল কাজ ফেলে ধ্যানে বসেন।

১৮৫। সাধকের এক এক সময় এমন হয় যে মন এক ঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে, মনে ভাব আসছে না, জপধ্যান ভাল লাগছে না, অথবা কুচিন্তা কুপ্রবৃত্তির দিকে মনের প্রবল গতি হচ্ছে, চেষ্টা করেও তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। তাঁদের পবিত্র সংস্পর্শে আসলে – তাঁদের দর্শনে, স্পর্শনে, তাঁদের সেবায় – তাঁদের সত্তা ও ভগবদ্ভাব অন্তরে সঞ্চারিত হয় ও প্রেরণা এনে দেয়, মনের ময়লা কেটে যায়, আবার নতুন উৎসাহে এগিয়ে যাওয়া যায়। সাধুসঙ্গের উপায় না থাকলে সৎশাস্ত্রপাঠ, সৎ আলোচনা, ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা, ভাল লাগুক বা না লাগুক তাঁর নামজপ করে যাবো – এই দৃঢ় সঙ্কল্প ও মনে জোর আনতে হয়। তাহলে দেখবে ভূত ভেগে যাবে। মনের ঘোর তমোণিশা কেটে যাবে।

১৮৬। মনকে সব সময় কোন না কোন কাজে লাগিয়ে রাখবে, কখনও বেকার বসে থাকতে দেবে না, দিলেই সে ভিরকুটি করবে ও তোমায় জ্বালাবে। যখন মন একান্ত খারাপ হবে, বা কোন প্রলোভন ও মানসিক উত্তেজনা চেষ্টা করেও এড়াতে সমর্থ হচ্ছ না দেখবে, তখন ঠাঁইনাড়া হবে, সেই প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে সরে পড়বে। প্রান্তরের মুক্ত বায়ুতে খুব হনহন করে তিন-চার মাইল বেড়িয়ে আসবে। তাহলে সেই নিম্নগামী ভাবটা কেটে যাবে, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যেও। প্রলোভন থেকে বাঁচবার মাত্র দুইটি উপায় আছে – হয় যুদ্ধ নয় পলায়ন। তবে মনের কাছ থেকে পালিয়ে থাকবার তো জো নেই; হয় তাকে বশ করতে হবে, নয় তো তার ইঙ্গিতে ওঠবোস করতে হবে।

১৮৭। কাঠের ভেতরকার আগুন যেমন ঘর্ষণের দ্বারা, দুধের মাখন যেমন মন্থনের দ্বারা, তিল হতে তেল যেমন পেষণের দ্বারা, মাটির ভেতরকার জল যেমন খননের দ্বারা পাওয়া যায়, সেই রকম জীবের হৃদয়গুহায় নিহিত তার স্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিও প্রাণপণ তপস্যা ও একাগ্রতা দ্বারা উপলব্ধ হন।

১৮৮। সাধকের প্রথম অবস্থায় ধ্যানজপ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বাড়াতে হয়। আজ যদি আধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট করে কর, কিছুদিন পরে একঘন্টা, পরে দেড়, দুই, এই রকম করে সাধ্যমত বাড়াবে। হঠাৎ আগ্রহাতিশয্যে বা মনের উত্তেজনায় জোর করে সামর্থ্যের বেশী করতে গেলে নিজেকেই পরে ভুগতে হয়। এর প্রতিক্রিয়া এত ভীষণ হয় যে সেটা সহ্য করা মহা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে স্নায়বীয় দুর্বলতা বা অবসাদ এত বেশী আসে যে, জপধ্যান করবার শক্তি ও ইচ্ছা পর্যন্ত চলে যায়, মাথাটা যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। পূর্বাবস্থা পেতে অনেক সময় ও বেগ লাগে, এমন কি মস্তিষ্ক-বিকারও হতে পারে। লাফিয়ে একেবারে ছাদে ওঠা যায় না, তাতে প'ড়ে হাত পা ভেঙ্গে যায়। ছাদে উঠতে হলে ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

১৮৯। যাঁরা ধ্যানজপ বা যোগ-অভ্যাস বেশী করেন তাঁদের নতুন সাত্ত্বিক শরীর গড়ে ওঠে, সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী ও নাড়ীচক্র তৈরি হয় যা গভীর অতীন্দ্রিয় ভাবের বেগ সহ্য করতে সমর্থ হয়।

১৯০। সন্ন্যাসীদের কোন ছত্রে এক জায়গায় বসে ভিক্ষা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। গৃহীরা শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষদের কল্যাণের জন্যে অথবা নিজেদের পাপক্ষয়ের বা পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ও নানা ঐহিক কামনা করে সাধুসেবার জন্য ছত্রাদিতে অর্থদান করে, সুতরাং ছত্রের অন্ন দূষিত, মনকে মলীন ও অধোগামী করে। সাধুদের তাই ছত্রে বসে খাওয়া নিষেধ। সাধুদের পক্ষে মাধুকরীই শ্রেষ্ঠ; মাধুকরীর অন্ন পবিত্র।

১৯১। যথোচিত সাধনভজন না করলে গৃহীদের দান গ্রহণ করার অধিকার সাধুদের নেই। তাতে গৃহীদের প্রতারণা করা হয় ও নিজেদের সাধুত্বের অপলাপ হয়। গৃহীরা সাধুসেবা করে এই ভেবে যে সাধুরা যেন অন্নবস্ত্রাদির জন্যে চিন্তিত না হয়ে সমস্ত সময় সাধনভজনে কাটাতে পারে। তাদের এই সৎকর্মের দ্বারা তারা সাধুদের ধর্মকর্মের পূণ্যফলের কতকটা অংশভোগী হয়। সেই জন্যে সাধুদের এতটা পূণ্যফল সঞ্চয় করা দরকার যাতে দাতাদের প্রাপ্য অংশ বাদ গেলেও নিজেদের জন্যে যথেষ্ট গচ্ছিত থাকে, নইলে দেউলে হলে নিজেদেরই মহা ক্ষতি হয়। ঐহিত ও পরলৌকিক দেউলেদের দুঃখের অন্ত নেই, তাদের নিত্য অভাব। সেইজন্য বৈরাগ্যবান্ সাধুরা ও ঠাকুরের পিতার ন্যায় নৈষ্ঠিক ধর্মপ্রাণ ব্রাক্ষণরা প্রতিগ্রহ করেন না। তা ছাড়া প্রতিগ্রহ করলেই বাধ্যবাধকতা আসে ও নিজের স্বাধীনতার হানি হয়।

১৯২। এই জীবনেই ভগবান লাভ করবার জন্যে লোকে বাপ মা ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য এড়িয়ে সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হয়। তাতে তাঁরা এর সাধনভজনের কতক অংশের ভাগী হন। তাই বলা হয়, "কূলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" তাতেই সন্তানের পিতৃমাতৃঋণ শোধ হয়। কিন্তু বাপ-মাকে কাঁদিয়ে এসে সন্ন্যাসী যদি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে অকাজে বা বৃথাকাজে দিন কাটায়, তাহলে তাঁদের চোখের জলে তার সমস্ত সুকৃতি ভেসে যায়। তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে সংসারাশ্রমে ফিরে যাওয়া ও সেই আশ্রমের ধর্ম পালন করা।

১৯৩। ভগবানলাভেই বালক গোপালের দুধের ভাঁড়ের মতো নিজের পরমার্থ-ভাণ্ডার অফুরন্ত হয়। তা থেকে যে যতই নিক না, যাকে যতই দাও না

কেন, তা পূর্ণ থাকে, কমতি বাড়তি হয় না। সে গল্প জান তো? এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর ছোট্ট ছেলে গোপালকে রোজ এক বনের মধ্য দিয়ে একলা পাঠশালায় যেতে হত। তার বড় ভয় করতো, তাই মাকে বলায় মা বললে, "কেন বাবা, ভয় কি? বনে তোমার মধুসূদন দাদা আছেন, তাঁকে ডাকলেই তিনি আসবেন।" সরল বালক তাই বিশ্বাস করলে ও ভয় পেলেই "কোথা আছ মধুসূদন দাদা?" বলে কাঁদতো। অমনি বনের ভিতর থেকে একটি সৌম্যদর্শন ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে, "এই যে ভাই আমি, ভয় কি?" বলে তার সঙ্গে খেলা ও গল্প করতে করতে তাকে জঙ্গল পার করে দিয়ে আসতো। কিছুদিন পরে পাঠশালার গুরুমশায়ের মার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে সব পোড়োরা – যাদের সঙ্গতি ছিল – অনেক রকম জিনিস নিয়ে গেল। কিন্তু গোপালের ঘরে দেবার মতো কিছুই ছিল না। তাই সে বিষন্নমুখে যাচ্ছে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে মধুসূদন দাদা তাঁকে একটি ছোট দুধের ভাঁড় দিয়ে বললে, তুমি এ ইটি দিও। গোপাল সেটি দিতে গুরুমশাই রেগে তাকে খুব ধমকালেন। কিন্তু যাই ভাঁড় খালি করছেন অমনি তা আবার ভরে যাচ্ছে দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। গোপালের কাছ থেকে সব শুনে, মধুসূদন দাদাকে দেখবার জন্যে তার সঙ্গে বনে গিয়ে তাঁকে ডাকতে বললেন। গোপাল তাই করায় দৈববাণী হল, "তোমার সরল বিশ্বাসের জন্যে তুমি আমার দেখা পাও, কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের মন কলুষিত বলে তিনি আমার দর্শনলাভের অধিকারী নন।"

১৯৪। ভগবানকে যে সরল বিশ্বাসে অন্তরের সঙ্গে ডাকে, তাঁকে ছাড়া আর কিছুই চায় না, সেই তাঁকে পায়। আর তাঁকে পেলে তার আর কিছু চাইবার বা পাবারও থাকে না। যে ইহকালের ও পরকালের সুখের জন্য তাঁকে ডাকে বা তাঁর কাছে ঐহিক বস্তু চায়, তাঁর ইচ্ছা বা দয়া হলে সে তা পেতে পারে, কিন্তু তাঁকে পায় না।

১৯৫। ব্রহ্মচারীর বা সন্ন্যাসীর আদর্শবিচ্যুতির কারণ কামিণীকাঞ্চন। কামকাঞ্চনের এমনি বিষম মোহ যে মহাযোগী জ্ঞানীদের পর্যন্ত অধঃপাতিত করে। তাই চারাগাছকে বাঁচাবার জন্যে যেমন বেড়া দিতে হয়, তেমনি ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জন্যে অনেক কঠোর নিয়ম শাস্ত্রে আছে। তুলসীদাস বলেছেন, "জহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম।" কবীর বলেছেন, "যে যোগী স্ত্রীসঙ্গ করে সে ঠগ, ভণ্ড।" ঠাকুর তাঁর যুবকভক্তদের মেয়েদের সঙ্গে এমন কি স্ত্রীভক্তদেরও সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন। বলতেন, "স্ত্রীভক্ত যদি (হরিনামে) কেঁদে ভাসিয়েও দেয়, তবু তার সঙ্গে মিশবি নি। তার মন ভাল হতে পারে, কিন্তু তোর মনে তো কুভাব আসতে পারে।" দেখাও গেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর উপদেশ পালন করতে না পেরে উচ্চ অবস্থা লাভ করেও ভবিষ্যৎ জীবনে পতিত হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৬। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমার উক্তি আরও কঠোর ও বিস্ময়কর। তাঁর কোনও দীক্ষিতা বালবিধবা কন্যাকে বলেছিলেন, "দেখো মা, পুরুষজাতকে কখনও বিশ্বাস করো না। অন্যের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমন কি স্বয়ং ভগবানও যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন তাঁকেও বিশ্বাস করো না।" ভাবটা হচ্ছে যতদিন দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততদিন কামও আছে, পতনের ভয়ও আছে। মন যতক্ষণ কাঁচা আছে, প্রলোভনে বিচলিত হবার সম্ভাবনা আছে, ততদিন নিজেকে তা থেকে সর্বপ্রযত্নে দূরে রাখতে হবে, নইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

১৯৭। কামের মতো ভীষণ দুর্দমনীয় শত্রু সাধকের আর দ্বিতীয় নেই। আমরণ অবিরাম সংগ্রাম ছাড়া এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। এ যে রাবণ যেমন বলেছিল, "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!" আমাদের পুরাণে কত মহা মহা যোগী ঋষির কাহিনী আছে, যারা শত শত বৎসর কঠোর তপস্যা করে শেষে কামিনীর মোহে পড়ে ব্রহ্মচর্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই শাস্ত্রে আছে, সাধু-ব্রহ্মচারীরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখবে না, এমন কি তার মুখের দিকে চাইবে না, তার সঙ্গে নিভৃতে বাক্যালাপ ও হাসিঠাট্টা ফুর্তি করবে না, স্ত্রীলোকের ছবি পর্যন্ত দেখবে না। কারণ এসব থেকে কাঁচা মনে কু-প্রেরণা আসতে পারে, মনে অসৎ ভাবের সংস্কার জন্মায় ও সেটা সুক্ষভাবে ক্রিয়া করে। তবে এসব কঠিন নিয়ম সাধারনের জন্যে নয়, সাধুব্রহ্মচারীর জন্যে, যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে, যোগসাধন ও কঠোর তপস্যার দ্বারা এই জীবনেই ভগবানকে লাভ করতে চায়। তারা ভিন্ন থাকের।

১৯৮। সেইজন্যে সাধকজীবনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে

অবাধ মেশামিশি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। প্রাচীন ও অধুনিক যে সকল ধর্মসঙ্ঘে ও অনুষ্ঠানে এর ব্যতিক্রম হয়েছে, সেগুলি সব কলুষিত ও অধঃপতিত হয়েছে। তার প্রমাণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়, এবং পাশ্চাত্যে মধ্যযুগের কতকগুলি খ্রীষ্টীয় রোম্যান ক্যাথলিক স্ত্রী ও পুরুষের মঠ। বুদ্ধদেবের সময় যখন ভিক্ষুণীদের (সন্ন্যাসিনীদের) জন্যে মঠ হল তখন তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসের বীজ রোপিত হল। অমন পরম দয়াল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এক অতি বিশিষ্ট স্ত্রীভক্তের কাছ হতে ভিক্ষা নেওয়ার জন্যে তাঁর প্রিয় বৈরাগী শিষ্য ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করেছিলেন! কি কঠোর লোকশিক্ষা!

১৯৯। কামভাব দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে – পুরুষের পক্ষে সব স্ত্রীলোকে মাতৃভাব এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে সব পুরুষে সন্তানভাব পোষণ করা। এ ভাব না থাকলে পতনের সম্ভাবনা থাকবেই। কামকে সংযত না করলে, ব্রহ্মচর্য না থাকলে মন স্থির হয় না, ঠিক ঠিক ধ্যান বা একাগ্রতা আসে না, ভগবানে রাগানুগা ভক্তি লাভ হয় না।

২০০। কাঁচা মন মহা মায়াবী। কারণ সে সাধককে কি ভাবে বিপথে নিয়ে গিয়ে অতর্কিতে মায়াজালে বদ্ধ করে, তা বোঝা বড় কঠিন। কাঁচা মনের স্বভাব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুখ খোঁজা, স্ত্রীপুত্রপরিবারকে আপনার জেনে তাদের মায়ায় মোহগ্রস্ত হওয়া, ধনজন যশ প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্বকে জীবনের একমাত্র কাম্য জ্ঞান করা। সুখের চেষ্টায় দুঃখ পেয়ে এবং পদে পদে ধাক্কা খেয়েও তার চৈতন্য হয় না। প্রতিদিন চারিদিকে মানুষ মরছে দেখেও কাঁচা মনের লোক ভাবে না যে তাকেও যে কোন মুহূর্তে সব ছেড়ে যেতে হবে। সে চায় কিসে ফাঁকি দিয়ে, চালাকি করে, যে কোন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করবে – তাতে অপরের ক্ষতি হোক, দুঃখ হোক, কিছু আসে যায় না, নিজের সুখ হলেই হল। ইহকালই তার সর্বস্ব।

২০১। কাঁচা মন খনি থেকে তোলা কাঁচা মালের মতো – ময়লা-মাটি, ভেজাল ও আবর্জনার সঙ্গে মিশে থাকে। রাসায়নিক উপায়ে তাকে ধুয়ে, জ্বালিয়ে শোধন করে নিলে তাকে খাঁটি সোনা বা তার চেয়েও কত মূল্যবান জিনিসে পরিণত করা যায়, বা মানুষের কত কাজে আসে ও তার জীবনরক্ষার সহায় হয়। সেই রকম কাঁচা মনকে যদি বিবেক অর্থাৎ সদসদ্‌বিচার দ্বারা ধুয়ে, ত্যাগ বৈরাগ্য ও ভক্তির আগুনে তার বিষয়বাসনা জ্বালিয়ে, গুরুদত্ত পরমার্থতত্ত্বের সাধনায় শোধন করে নেওয়া যায় তাহলে তাই শুদ্ধ, পাকা মনে পরিণত হয়। নিত্যশুদ্ধ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর সেই শুদ্ধ, পাকা মনে পরিণত হয়। নিত্যশুদ্ধ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর সেই শুদ্ধ, পাকা মনের গোচর হন।

২০২। মন যেন ফলের মতো। কাঁচা বেলায় ফল টক্, কষা বা বিস্বাদ লাগে এবং খেলে নানারকম রোগ হয়। কিন্তু সেই ফলই পাকলে কেমন সুস্বাদু, ও উপকারী হয় – দেবতার ভোগে পর্যন্ত আসে। মনও তেমনি।

২০৩। কাঁচা মনের সত্ব, রজঃ, তমঃ আছে। যাদের সত্ব তাদের ধর্মভাব আছে, ধর্মলাভ করবার, সৎপথে চলবার ও পরের উপকার করবার ইচ্ছা আছে ; তারা এজন্য চেষ্টাও করে থাকে, কিন্তু নানা করণে নিজেকে দুর্বল ও অপটু ভেবে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না, সহজে দমে যায়। যাদের রজঃ তারা সংসারে ও বিষয়কর্মে এত লিপ্ত থাকে যে ধর্মের জন্য বড় মাথা ঘামায় না, কিংবা ধর্মের ভান দেখায় মাত্র। যাদের তমঃ তারা দুরাচার। কিসে পরের অনিষ্ট করবে, পরের সর্বনাশ করবে, তাদের এই চিন্তা ও চেষ্টা। তারা কামুক, লোভী ও পাপাচারী।

২০৪। কাঁচা মন নিয়ে যাঁরা দেশের বা জগতের হিত করবার জন্যে নিজেকে নিয়োগ করেন বা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁদের দ্বারা জগতের হিতের চেয়ে বরং অহিতই বেশী হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁরা আদর্শে দীর্ঘকাল অটুট থাকতে পারেন না। নামযশের ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রভুত্ব করবার স্পৃহা তাঁদের বলবতী হয়। দ্বেষ, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা তাঁদের এমনি পেয়ে বসে যে, সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজেদের অন্তরের বিষ জনসমাজে ছড়িয়ে বহু সদিচ্ছাপরায়ণ লোককেও কলুষিত করেন, এবং সৎকর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি, এমন কি ধর্মের উপর সাধারণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব উৎপাদন করেন।

২০৫। আদিতে সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন। একলা ছিলেন, ভালই ছিলেন। কি কুক্ষণেই তিনি "বহু স্যাম্" — আমি বহু হব — এই সঙ্কল্প করলেন, এবং তাঁকেও "তপস্তপ্‌ত্বা" — তপস্যা করে, ধ্যান লাগিয়ে — জগৎ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সমস্ত স্থাবরজঙ্গম জীবজন্তু সৃষ্টি করে তিনি তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন ও একমাত্র মানুষকেই বিচার বুদ্ধি দিলেন। ফলে "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" এখন এই বুদ্ধিমন্ত "বহুরা" নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, অকর্মণ্যতাদি যত দোষ-ত্রুটি তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস! কোন কাজে নিজেদের দোষে বা চেষ্টার অভাবে বিফল হলে বলেন, "তাঁর ইচ্ছা নয়।" আর যেটা করার ভাবি ঝোঁক, করে ফেলে পস্তান, আর বলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় হয়েছে।" পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করছেন, না করছেন, তাঁরা সব জেনে ফেলে দিয়েছেন! তা হলে তাঁরা তো কেউ-কেটা নন — সর্বজ্ঞেরও-মর্মজ্ঞ! তাঁরা এও বলেন, "বে করে সংসারী হওয়াই ভগবানের অভতপ্রেত, সকলে সাধু হয়ে গেলে সৃষ্টিরক্ষা হবে কি করে?" যেন এই ভেবে ভেবে তাঁদের রাত্রে ঘুম হয় না! যেন জগৎ-সুদ্ধ লোক সাধু হবার জন্যে মরণপণ করেছে!

২০৬। আমরা কথায় কথায় যে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বলি ও ঈশ্বরের দোহাই দিই, সেটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র; যেমন ছোট ছেলেমেয়েরা বলে, "মাইরি, ঈশ্বরের দিব্যি",বা ইংরেজরা বলে, "Thank God!" (ভগবানকে ধন্যবাদ) বা "My God!" (হা ভগবান)! "ঈশ্বরেচ্ছা" বোধ তারই ঠিক হয় ও ঐ ভাবের কথা বলা তার মুখেই সাজে যে সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, যে জানে, "আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী", যার নিজের ভালমন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই, যে নিন্দাস্তুতিতে, লাভালাভে, সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন।

২০৭। বেদ বলেন, যা পূর্ণ তা ত্রিকালেই পূর্ণ; তার কমবেশী, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। পূর্ণ হতে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই বাকি থাকে, পূর্ণতে পূর্ণ যোগ করলেও সেই পূর্ণই থাকে। তা একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা। তেমনি পূর্ণের বিনিময়েই পূর্ণত্ব লাভ হয়। পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে পেতে গেলে শরীরের পূর্ণ সামর্থ্য ও সমস্ত মন, প্রাণ অন্তঃকরণ নিয়োগ করে তাঁতে তন্ময় হয়ে সাধন করলে তবে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

২০৮। কিন্তু সকলের শক্তি সামর্থ্য এক নয়, ব্যক্তিভেদে তারতম্য আছে। একজন দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক সংসারের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে, দিনে একবেলা সহজসাধ্য ভিক্ষান্ন বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত ফলমূলাদি খেয়ে নির্জনে সর্বদা মনঃসংযম ও চিত্তবৃত্তিনিরোধের চেষ্টায় যোগাভ্যাস করছে তার পক্ষে ভগবানলাভ বা সমাধি সুগম হতে পারে। কিন্তু আর একজন মুমুক্ষু প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ক্রমাগত নানা বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সংসারে অসহায় বুড়ো বাপ-মার সেবা ও স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালনে ব্যস্ত। আবার অপর এ কজন ভক্ত দীর্ঘকাল কঠিন রোগে শয্যাগত, অসহায়, তার শরীর মন যথাযথ সাধনভজন করতে অক্ষম, অবসন্ন। তাদের মুক্তির কি কোন উপায় হবে না? তারা কি অনন্তকাল ধরে কার্যকারণ-সমুদ্রে ঝড়ের সময় ছোট নৌকার মতো আছাড় খেতে থাকবে — তাদের উদ্ধারের কি কোন আশা নেই? তারা কি কর্মবিপাকে নির্মম কার্যকারণচক্রে পোকা মাকড়ের মতো পিষে যাবে? না, করুণাময় পরমেশ্বরের রাজত্বে তা কখনো হতে পারে না। তাদের বুকফাটা কান্না তাঁর কানে পৌঁছুবেই এ বং তারা প্রাণের ভেতর আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনতে পাবেই। তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তাদের মুক্তির আকাঙ্খ্যা যদি গভীর ও প্রবল হয় ও নিজেদের অক্ষমতা উপলব্ধি করে তারা ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, এবং ভগবানেরই সংসার জেনে কর্তব্যবুদ্ধিতে সমস্ত কাজ নির্লিপ্তভাবে করে যায় — কোনও কাজে বা কারও প্রতি মায়ামমতায় বদ্ধ না হয়, ভগবান ছাড়া আর কাউকে অন্তর হতে ভাল না বাসে, তা হলে তারাও কপালমোচন প্রেমময়ের অপার কৃপায় জীবনে শান্তির অধিকারী হয়, ও অন্তে পরমপাদ লাভ করে।

২০৯। সবই হচ্ছে মনের ব্যাপার, মনের উপরই সব নির্ভর করে। মনেই বন্ধন, মনেই মুক্তি। যেমন মতি তেমনি গতি। উপরোক্ত যোগী সকল রকম অনুকুল অবস্থার মধ্যে কঠোর তপস্যাচরণ করেও অন্তরে নিহিত বাসনার বশে বিষয়সুখের ও নামযশের প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়, তা হলে তার সমস্ত সাধনভজন ও তপস্যা ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো পণ্ডশ্রম মাত্র। আর ত্রিতাপদগ্ধ জীব সংসারের অসারতা হাড়ে হাড়ে

উপলব্ধি করে বিষয়ে বীতরাগ হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যদি ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তা হলে তিনি তাকে বার বার জন্মমরণরূপ দুঃখ হতে ত্রাণ করেন।

২১০। সন্ন্যাসীই হও অথবা গৃহীই হও নিজ নিজ পথে প্রাণপণ খাটতে হবে, জীবনকে সাধনার অনুযায়ী করে গড়তে হবে। ফাঁকি দিয়ে বস্তুলাভ হয় না, ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকে পড়তে হয়। তবে মনে হয় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি সন্ন্যাসীদের চেয়ে গৃহী ভক্তদের ওপর কিছু বেশী। কারণ সন্ন্যাসীরা তো ভগবানকে ডাকবার জন্যেই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এ সেছে, তারা যদি তাঁকে না ডকে তো সে মহাপাপ। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ গৃহী ভক্তরা কঠোর সংসার পথে মাথায় বিষম ভারী বোঝা নিয়েও তাঁর স্মরণ-মনন ও কৃপাভিক্ষা করে এবং সাধু-ভক্তদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা করে, এবং ধার্মিক ধনীরা দান ধ্যান ও দরিদ্র ও সাধুদের জন্যে আতুরাশ্রম, সেবাশ্রম, ধর্মশালা ও ছত্রাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা পুণ্যকর্ম করে।

২১১। ভগবানলাভ সকলের ভাগ্যে এই জন্মেই হয় না। যাঁরা জন্মজন্মান্তর তাঁকে পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা ও সাধনভজন করে এসেছেন, সামান্য একটু কর্ম বাকি ছিল, তাঁরা সেই পূর্বজন্মের সাধনের প্রভাবে সৎসংস্কার ও প্রেরণা-লাভ করে বাকিটুকু এ জন্মে সাধনার অনুকূল অবস্থা পেয়ে সহজে শেষ করে জন্মমরণহীন পরমপদে লীন হন।

২১২। কোন কর্মই বৃথা যায় না, নষ্ট হয় না। তার সুফল বা কুফল কখনও না কখনও ফলবেই। সেইজন্যে যা সৎকর্ম তা সব রকমে সব অবস্থাতেই করা উচিত। আর সেইটিই মূলধনস্বরূপ হয়, যা থেকে পূর্বকৃত কুকর্ম ও পাপরাশির দেনা শোধ হয়।

২১৩। সৎকর্মের ফল অক্ষয়। যত বেশী সেটি সঞ্চয় করা যায়, ভবিষ্যতে, এই জন্মে ও পরজন্মে, বিপদে ও দুঃখশোকে, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে, ভয়ে প্রলোভনে, আঁধারে হতাশে তা পরম উপকারে আসে। অন্য সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, তার অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, ক্ষয়ে দুঃখ, তাকে সঙ্গে করেও নিয়ে যাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, আবার সেই সবের অতৃপ্ত চাপা বাসনা সংস্কাররূপে পেছু নিয়ে পরজন্মে জোর করে নূতন কর্মফলে জড়িয়ে ও নূতন নূতন বন্ধনে ফেলে অশেষ দুঃখ দেয়।

২১৪। সংসারাবদ্ধ জীব, ঠাকুর যেমন বলতেন, কাঁচা সুপুরি বা নারকেলের মতো – তার শাঁসটা বাকল বা খোলের সঙ্গে এমনি ভাবে জড়িয়ে এক হয়ে থাকে যে, সহজে আলাদা করা যায় না, কিন্তু পেকে শুকিয়ে এলে সহজে আলাদা হয়ে যায়। তেমনি দেহতে যতদিন আত্মবুদ্ধি থাকে, দেহের সুখ-দুঃখে যতদিন নিজেকে সুখী দুঃখী মনে হয়, ততদিন মায়ায় বদ্ধ হয়ে অবিরাম ত্রিতাপে দগ্ধ হতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি বা কর্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যখন ভগবৎ-কৃপায় আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে পৃথক্ জ্ঞান হয় ও অখণ্ড সৎস্বরূপ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলে উপলব্ধি হয় তখনই জীব মুক্ত হয়।

২১৫। কর্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, আত্মজ্ঞান হয়। কর্ম আমরা সকলেই করি, কিন্তু কর্মযোগ সাধন করি না, তাই কর্মে বদ্ধ হই ও দুঃখ ভোগ করি। কর্মযোগ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়, এ বং "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ" – যারা ফলের জন্যে কর্ম করে তারা দীন, নীচু থাকের। কর্ম কর, কিন্তু যে কাজই করবে তা নিস্বার্থভাবে, নির্লিপ্ত ও নিষ্কামভাবে কর, তা হলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে, এ বং সুখদুঃখের অতীত পরম আনন্দ লাভ করে কৃতকৃতার্থ হবে।

২১৬। অনেকের ধারণা, যদি নিষ্কাম হয়ে কর্ম করা যায় তাহলে কর্মে প্রেরণা বা টান আসবে ক করে? সমস্ত মন লাগিয়ে কর্মে মেতে যাবো কি করে? যদি নিজের কোন লাভই না হয় তো কর্ম করতেই বা যাব কেন? এ ধারণা মহা ভুল। সুখের জন্যেই তো লোকে কর্ম করে, কিন্তু সুখ তো কত লাভ হয়! ন'ভাগ দুঃখ আর এক ভাগ বা তারও কম হয় তো সুখ – তাও আবার অস্থায়ী ও দুঃখের ভেজাল মেশানো। আর প্রায়ই নিজের স্বার্থের জন্যে পরকে বঞ্চিত করতে, দুঃখভোগী করতে, পরের অনিষ্ট করতে হয়। জগতে যা কিছু চিরস্থায়ী সুখ তা কেবলমাত্র নির্লিপ্ত, কর্তৃত্ববোধহীন, নিঃস্বার্থ কর্মীর দ্বারায় নিষ্পন্ন হয়। সমস্ত ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো অক্লান্ত কর্মী ক'জন হয়েছে? তাঁরাই আদর্শ পুরুষ, যাঁরা আবহমানকাল থেকে অসংখ্য নরনারীকে জীবনের দুঃসহ ভার বহন করতে সক্ষম করেছেন,

পাপপঙ্কে মগ্ন, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রাণে আশা ও শান্তির সঞ্চার করেছেন। তাঁদের উপদেশ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক জীবনকে তুচ্ছ করে পরের জন্যে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে ও মৃত্যুহীন প্রাণ পেয়েছে।

২১৭। নির্লিপ্ততা, বিষয়ে অনাসক্তি, সর্বজীবে প্রেম সকলধর্মের মূলমন্ত্র। যাঁর এসব গুণ আছে তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বশ নন, তাঁর নামযশের ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই, " আমি আমার" অভিমান নেই, আত্ম-পর বুদ্ধি নেই। তিনি ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সাধু-অসাধু, শত্রু-মিত্র, পশুপক্ষি-কীট সর্বজীবে সমদর্শী। তিনি স্তুতি-নিন্দায়, লাভালাভে, জয়-পরাজয়ে, সুখ-দুঃখে, হর্ষবিষাদশূন্য, নির্বিকার। তিনি কর্ম করেও কর্ম করেন না, কর্ম না করেও কর্ম করেন। তিনিই যথার্থ কর্মযোগী।

২১৮। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্যদেহের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রিয়া করছে তাকে সংযত করা। সেই প্রাণশক্তি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে। এদের নিয়মিত ও সাম্যভাবে (rythmically) প্রবাহিত করতে পারলে মনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের উপশম হয়, মন স্থির হয়। নানা বিষয়ে মন ছড়িয়ে রয়েছে বলে তার শক্তির হ্রাস হয়। সেই সমস্ত ছড়ানো শক্তিকে যদি কোন বিষয়ে কেন্দ্রিভূত করা যায় তো তার ক্ষমতা অসীম; যোগশাস্ত্র মতে তার অসাধ্য কিছুই নেই। পারমার্থিক রাজ্যে সেই একাগ্র শক্তিকে পরমাত্মার স্বরূপ ধ্যানে নিয়োগ করলে জীব নির্বিকল্প সমাধিযোগে পরব্রহ্মে লীন হয়; হৃদয়-কমলে সাকার ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় হলে, ইষ্টদর্শন বা ভগবানলাভ হয়। আবার আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক ব্যাপারে প্রয়োগ করলে ঐ সম্বন্ধে নানা সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত সত্যের আবিস্কার হয়, অষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ নানা দিব্য ঐশ্বর্য ও অলৌকিক বিভূতি লাভ হয়।

২১৯। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা – যোগশাস্ত্র মতে এ ইগুলি হচ্ছে অষ্টসিদ্ধি।

২২০। যোগসাধনের সর্বোচ্চ অবস্থা নির্বিকল্প বা সবিকল্প সমাধিলাভের পথে এইসব বিভূতি বা অষ্টসিদ্ধি ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও মহা অন্তরায়। সাধক এদের বশে আসলে নানা কামনায় বদ্ধ হয়ে শুধু যে যোগভ্রষ্ট হয় তা নয়, এদের অপব্যবহারে অতি নীচপ্রবৃত্তি হয় ও ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করে, আর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বহুলোকের সর্বনাশও করে ও নিজেরও অধঃপতন হয়। ফলে তার এই সকল শক্তিও লোপ পায়।

২২১। যোগ সাধন করা বড় কঠিন,সাধারণ লোকের জন্যে নয়। বিশেষতঃ বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এ সব নিয়ম যথাযথ পালন করা এক রকম দুঃসাধ্য; যেমন সাত্ত্বিক ও অল্প আহার (ফলমূল ও দুধ), পরিমিত ব্যায়াম ও নিদ্রা, নির্মল বায়ুযুক্ত নির্জন স্থানে বাস, উদ্বেগশূন্য জীবন, সকল বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা, বিশেষ করে কঠোর ব্রহ্মচর্যরক্ষা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আর যোগসিদ্ধ গুরুর কাছে বাস। এই সবের কোন একটির ব্যতিক্রম হলে সিদ্ধিলাভ দুর্লভ। অথবা গুরুপদিষ্ট প্রক্রিয়ার সাধনে কোন ভুল বা ত্রুটি হলে, কিংবা বই পড়ে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী অভ্যাস করলে স্নায়বিক বা হৃদযন্ত্রের দুরারোগ্য ব্যধি, এমন কি মস্তিষ্কবিকৃতিও হতে পারে।

২২২। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অসম অর্থাৎ অতিদ্রুত বা অতিক্ষীণ হয় কি কারণে? যখন আমরা কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হই – সুখের আশায় ভোগ্য বস্তুর পেছনে ছুটে দিশেহারা হই, তাতে কেউ বাধা দিলে ক্রোধে অধীর হই, বিফল হলে নৈরাশ্যে ডুবে যাই, সফল হলে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না, মোহে দিক-বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, পরের ভাল দেখলে হিংসায় গা জ্বলে যায়, যখন বিপদে-আপদে ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়, ভাবী বিপদের আশঙ্কায় চিন্তায় জর্জরিত হই, যখন স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণ ও রক্ষার জন্যে উদ্বিগ্ন হই, দুঃখ ও অভাবের তাড়নায় মুহ্যমান হই, রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করি, প্রিয়জনের শোকে চারিদিকে অন্ধকার দেখি, ধন-সম্পদ নাশে পাগলের মত হই – তখনই মন দারুণ চঞ্চল হয়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও কখনও দ্রুত ও হাতুড়িপেটার মতো, কখনও বা ক্ষীণ বা বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়। মনের এই বিষম চঞ্চলতায় প্রাণবায়ুও চঞ্চল হয়, রক্ত-চলাচলেরও গোলমাল হয়।এ সবের মূল কারণ দূর করতে না পারলে, বিষয়বাসনায় বীতস্পৃহ না হলে, পরমার্থ-চিন্তা বা একাগ্রভাবে জপধ্যান করা একেবারেই অসম্ভব, তা যতই প্রাণায়াম কর না কেন, যতই

প্রার্থনা কর না কেন।

২২৩। অনেকে হয়তো মনে করে, আমার শরীরের ওপর তেমন আসক্তি নেই, সংসারের ওপর, স্ত্রী-পুত্রাদির ওপর তেমন মায়া মমতা নেই, টাকা পয়সায় তেমন আঁট নেই, আমি কিছুরই বশ নই, মনে করলেই সব ঝেড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু যখন অন্তরের ও বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে অথবা অদৃষ্ট-বিপর্যয়ের বিষম পরীক্ষায় পড়ে হাবুডুবু খেতে হয়, তখন ক্ষণেকের জন্যেও চৈতন্য হয়, – তখন ধারণা হয় মায়ার সাংঘাতিক নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিজের আশাহীন দুর্দশার কথা। যাদের পূর্বজন্মের শুভসংস্কার থাকে তাদের সেই বন্ধন অসহ্য হয়। তারা যে কোন উপায়েই হোক সেই বন্ধন হতে মুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তারা হচ্ছে মুমুক্ষু।

২২৪। আর এক থাকের জীব আছে যারা পুরুষানুক্রমে ক্রীতদাসের মতো পরাধীন জীবন যাপন করে। সেইটিই এমন স্বভাবিক হয়ে যায় যে তারা স্বাধীনতার নামে ভয় পায়, তারা ভাবে এই বেশ আছি। এই সব ছেড়ে দিয়ে যদি অজানা অনিশ্চিত মুক্তিপথ আশ্রয় করতে হয় তো আমি মুক্তি চাই ন। বিষ্ঠার কীটকে ফুলের গাদার মধ্যে রেখে দিলে হাঁপিয়ে মারা যায়। তারাই হচ্ছে বদ্ধজীব।

২২৫। সংসার যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই হ'ত – রোগ, শোক, দুঃখ, অভাব, আপদ, বিপদ, ভয়, ভাবনা না থাকতো – তা হলে কে আর ভগবানকে ডাকতে যেতো? এ সব তিনি দিয়েছেন আমাদের শিক্ষার জন্যে, পরীক্ষার জন্যে, যাতে লোকে তাঁকে ভুলে না থাকে, নিরুপায় হয়ে যাতে তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাই সুখে দুঃখে সব অবস্থাতেই তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাঁকেই তোমার সর্বস্ব জেনে প্রাণভরে ভালবাসবে, তিনিই তোমার একমাত্র গতি, সহায় ও সম্বল জানবে। তাহলে দেখবে দুঃখ-শোক, যত কিছু অমঙ্গল সব পালিয়ে যাবে, কিছুতেই মনকে বিচলিত করতে পারবে না, প্রাণ আনন্দে ভরে থাকবে।

২২৬। শ্রীশ্রীভগবানের ভালবাসার কাঙ্গাল হও। তাঁর প্রেমময় মূর্তি দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। তাঁর জন্যে পাগল হও, যেন তাঁকে ছাড়া জীবন দুর্বহ হয়। তাঁর মতন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে? তাঁর মতো আপনার জন, মনের মানুষ আর কে আছে? শত অপরাধ করেও অনুতপ্ত হলে তিনি ক্ষমা করেন, কোলে নেন। তাঁর ভালবাসা অসীম, ধারণাতীত; তিনি অনন্ত সুখের পারাবার। তিনি অমৃতের সাগর। তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়, অমৃতত্ব পাবে, আনন্দে টুসটুস হয়ে আনন্দে ভাসবে, – রসগোল্লা যেমন রসে ভাসে। সাধে কি আর ভক্ত ভগবদ্-রস আস্বাদন ছেড়ে মুক্তি বা নির্বাণ চায় না!

২২৭। মাতাল দুরকম স্বভাবের আছে। এক রকমের মাতাল খুব মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে আনন্দে 'মা' 'মা' বলে হুঙ্কার দেয় ও শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রেমাশ্রুতে ভেসে যায়। আর এক রকমের মাতাল এত বেশী মদ খায় যে শেষে বুঁদ হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে, তার ঐ রকমটি না হলে আশ মেটে না। প্রথমটি ভক্ত, দ্বিতীয়টি জ্ঞানী। দুজনেই নিজের ভাবে সাধনায় তন্ময় হয়, তবে ভক্ত 'তস্য অহং' (আমি তাঁর) ভাবটি রেখে দেয়, আর জ্ঞানী নিজের অহংকে তাঁতে লয় করে দেয় 'সোঽহং' ভাবে – আমিই সেই অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা। কার আনন্দ বেশী বল দেখি? দুই-ই জ্ঞান ও ভক্তির চরম অবস্থা, এ কাত্মভাবে, সেখানে দুইয়ে মেশামেশি, কে কোন্‌টি চেনা যায় না।

২২৮। নিরাকার ব্রহ্ম ভৌতিক আকাশের মতো বিরাট নন। তিনি অখণ্ডচৈতন্য-স্বরূপ। এই চৈতন্য সর্বব্যাপী – সকল বস্তুতে ওতপ্রোত। তাঁরই সত্তায় বস্তুতে ওতপ্রোত। তাঁরই সত্তায় তাঁরই অস্তিত্বে সকল জিনিসের অস্তিত্ব, তাঁরই চিৎপ্রভায়, তাঁরই জ্ঞানের আলো থেকে জাগতিক জ্ঞান, তাঁরই আনন্দে সৃষ্টির যত কিছু আনন্দপ্রবাহ। এই ভাবে তিনি বিরাট। ধ্যানের সুবিধার জন্যে আকাশ তাঁর একটি উপমা মাত্র।

২২৯। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥
গীতা, ৪।২৮

হোমাগ্নিতে, আহুতিদানের পাত্র (স্রুবাদি) ব্রহ্ম, আহুতির ঘৃত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা হোম করেন। কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধি করে তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

গীতার এই শ্লোকটির তাৎপর্য হচ্ছে – যা কিছু করা যায় সবই ব্রহ্মবুদ্ধিতে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে

নিজেকে এক ভেবে করতে হবে।তা হলে সমস্ত জীবনই এক অখণ্ড যজ্ঞস্বরূপ হয়ে যায়, যাতে কর্তা, কর্ম, করণ, অভীষ্ট এ সবই ব্রহ্ম। সব কাজই ভাববে যজ্ঞস্বরূপ, তাঁরই আরাধনা। খাবার সময় ভাববে খাদ্য তিনিই, ভোজন ব্যাপারটিও তিনি, তার করণও তিনি, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা খাই তাও তিনি, আবার ভোক্তাও তিনি। ব্রহ্মরূপ জঠরাগ্নিতে যেন অন্ন আহুতি দিচ্ছ এই বুদ্ধিতে আহার করবে। শুধু খাওয়া কেন, জগতের প্রত্যেক জিনিসে, প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক চিন্তায় এই ব্রহ্মবুদ্ধি আনতে হবে। এই হচ্ছে জীবের সমস্ত কর্মফল-নাশের একমাত্র উপায়, কারণ তার কর্ম ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে আর কোন ফল উৎপন্ন করে না। আমাদের সকল কর্মের মধ্যে, সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে ভগবানকে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাঁর মঙ্গল স্পর্শ, তাঁর মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সবেতে যেন সব সময় যেন অনুভব করতে পারি, 'আমি কর্তা' এই অহং-বুদ্ধি ত্যাগ করে সমস্ত কর্মের ফলাফল যেন আমরা তাঁতে সমর্পণ করতে পারি – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই এই শ্লোকে উপদেশ করেছেন।

আমাদের মঠের প্রায় সকল কেন্দ্রেই দুবেলা আহারের পূর্বে এই শ্লোকটি সমস্বরে আবৃত্তি করা হয়।

২৩০। রামপ্রসাদের এই ভাবের বেশ একটি গান আছে :

((পিলু বাহার – যৎ)

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে,
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
চর্ব চূষ্য লেহ্য পেয়, যত রস এ সংসারে,
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।

২৩১। এই দেহ অনিত্য, এটা পরিণামে কৃমি ও ভস্মরূপে পরিণত হবে ও দুর্গন্ধ মল, মুত্র, শ্লেস্মা, রক্ত, মেদ, মজ্জা, মাংস প্রভৃতি অপবিত্র ঘৃণ্য জিনিসে এ দেহের উপাদান। এই রকম একটা হাড়মাংসের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে জীব কি ভয়ানক মোহগ্রস্ত হয়! এতেই আসক্ত হয়ে এবং এতে আত্মবুদ্ধি করে অহরহঃ অশেষ কষ্ট ভোগ করে, তবুও তো চৈতন্য হয় না। মহামায়ার এমনি মায়া, কি কুহক করেই রেখেছে! যারা মোক্ষকামী তারা শরীর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বস্তু অসার ও অনিত্য জেনে এই সর্বনাশকর মোহজাল ছেদন করে নিত্য বস্তুর আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হবে।

২৩২। সাধক কবি গেয়েছেন,

এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছ কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা বুঝতে পারে॥
বিল করে ঘুন্নি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাতায়াতের পথ খোলসা, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটিপোকায় গুটি করে, কাটলেও সে তো কাটতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি, আপনার নালে আপনি মরে॥

২৩৩। উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া, তাঁর সমীপে আসীন হওয়া। বৃথা চিন্তা ও বৃথা কাজে আমাদের উপকার সাধিত না হয়ে অপকারই হয়ে থাকে। ওতে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি, এবং ওগুলো আমাদের ভগবান থেকে সরিয়ে কোথায় আঁস্তাকুড়ে নিয়ে যায়। যতই আমরা সেই সব বৃথা চিন্তা ও কাজ এবং অনিত্য বিষয়গুলি থেকে তফাত থাকি আর ভগবানের স্মরণ-মনন, ধ্যান, পূজা ও নামজপাদিতে, এবং পরোপকার ও জীবসেবাদি সৎ কাজে নিজেদের নিয়োগ করি, ততই আমরা ভগবানের নিকটবর্তী হই, তাঁর ভাবে ভাবিত হই ও আমাদের অন্তর আনন্দে ভরে যায়। সংসার জয় করবার, দুঃখ অশান্তি থেকে বাঁচবার আর অন্য কোন উপায় নেই।

২৩৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের দুটি উক্তি পূজনীয় প্রেমানন্দ স্বামীর মুখে বরাহনগর মঠে শুনেছিলাম। ও দুটি কোথাও বেরিয়েছে বলে দেখিনি। উক্তি দুটি এই – "আচার্যকোটিরা যেন পাকা ঘুঁটি কেঁচে বসে ফের খেলে। তারা জানে দুই, চার, ছয়, আট, দশ সব তাদের হাতের মধ্যে। অন্য কাঁচা ঘুঁটির সঙ্গে জোড় লাগিয়ে তাকেও পার করে দেয়। জোড় লাগাতে চেষ্টা কর। দাবা বোড়ে খেলায় জোড়কে কেউ মারতে পারে না। তেমনি গুরু পেলে আর ভয় নেই।"

২৩৫। "এক মাগী অনেক কষ্টে এক জোড়া সোনার বালা গড়িয়ে পরেছিল। কিন্তু কেউ আর তার বালার

তারিফ করে না। হতাশ হয়ে সে নিজের কুঁড়েয় আগুন লাগিয়ে চেঁচিয়ে লোক জড় করে হাত নাড়া দিয়ে বলতে লাগলো, 'ওগো তোমরা সকলে দেখ, আমার ঘরে আগুন লাগলো! আমার যথাসর্বস্ব পুড়ে গেল গো, কেবল এই এক জোড়া বালা আছে।' হীনেরাও তেমনি সামান্য কিছু হলে বা পেলে তা দেখিয়ে বেড়াবার জন্যে অস্থির হয়, নিজের লোকসান করেও।"

২৩৬। মানুষের সমস্ত জীবনটা প্রলোভনের সমষ্টি। কামাদি ছয় রিপুর চোখে ঘুম নেই, তারা কেবল ঘুরে বেড়ায় কাকে ফাঁদে ফেলে গ্রাস করবে। তাই সব সময়েই সজাগ থাকতে হবে, হুঁশিয়ার থাকতে হবে, সর্বদা সদসৎ বিচার ও প্রার্থনা করতে হবে। চোর যদি দেখে যে ঘরে আলো জ্বলছে ও কেউ জেগে আছে, সে ঘরে সে সিঁধ কাটে না, অন্যত্র চলে যায়। যেই তুমি একটু আলগা, অসাবধান বা দুর্বল হয়ে পড়েছ, তেমনি তোমার শত্রুরাও ফাঁক পেয়ে জোর করবে, বার বার হেরে গেলেও তোমায় পাকেচক্রে পাড়বার চেষ্টা করবে, কিছুতেই থামবে না বা হঠবে না। কিন্তু তুমি কিছুতেই দমে যাবে না, বার বার পড়ে গেলেও আবার নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়াবে ও লড়বে। তা হলে দেখবে তোমার হারও জিতেরই সামিল হবে। এতে তোমায় প্রতিবারই আরও খানিকটা এগিয়ে দেবে। যারা উচ্চ জীবন যাপন করতে আন্তরিক আগ্রহান্বিত, তাদের ভগবানই সাহায্য করেন, বল দেন, প্রেরণা দেন, তাদের বাধাবিঘ্ন দূর করে পথ সুগম করে দেন। তারা যখন রিপুগুলোর সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে পরিশ্রান্ত হয়ে ব্যাকুল অন্তরে তাঁর শরণাপন্ন হয়, তখন তিনিও তাদের কোল দেন। তিনি যে শরণাগতবৎসল।

২৩৭। ভক্ত ভগবানের সেবা করে, না ভগবান ভক্তের সেবা করেন? এমন সময় আসে যখন ভক্ত দেখে যে, সে আর কি সেবা করছে বা করতে পারে, ভগবানই তার সেবা করছেন। তার তো গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা – তাঁরই দেওয়া জিনিস তাঁকে দেওয়া। ভক্ত তো নিজের বিষয় ভাবে না, ভগবানকেই তার জন্যে ভাবতে হয়। ভক্ত বলি কাকে? – যাঁর ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি – নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি, যিনি ভগবৎপ্রেমে উন্মাদ। এমন সদা তদ্গতচিত্ত ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' এরূপ ভক্ত বড়ই দুর্লভ। আমাদের পুরাণ ইতিহাসে তাঁদের কথা আছে, যেমন নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব, বিদুর, শ্রীরাধা ও বৃন্দাবনের গোপগোপীরা, উদ্ধব, মহাবীর প্রভৃতি; ঐতিহাসিক যুগে চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ, রামানুজ, তুকারাম, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, পওহারীবাবা, নাগ মহাশয় প্রভৃতি। তন্মধ্যে শ্রীরাধা, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার জ্ঞানে পূজিত হন।

২৩৮। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিতে, শুদ্ধ প্রেমে ভগবান ভক্তাধীন হন, প্রেমের দায়ে ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন, পরাজয় স্বীকার করেন। প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে ভক্তহৃদয়ে অচলভাবে বিরাজ করেন। ভক্তকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই।

২৩৯। ভক্ত যেমন ভগবানকে ছেড়ে থাকতে পারে না, ভগবানও তেমনি ভক্তকে ছেড়ে থাকতে পারেন না – প্রেমাসক্ত যুবক-যুবতীর মতো। তবে যুবক-যুবতীর প্রেম রূপজ ও গুণজ, নিজের সুখ ও স্বার্থের আঁশটে গন্ধে ভরা – সেগুলোর এদিক ওদিক হলে বা চালচলনের মিল না হলে আর থাকে না, মুখে তিক্ত স্বাদ রেখে যায়। কিন্তু ঐশ্বরিক প্রেম নিষ্কাম, অপার্থিব, অন্তহীন। সে প্রেমসুধা যতই পান করা যায় ততই পিপাসা বেড়ে যায়, কিছুতেই আশ মেটে না। প্রেম, প্রেমময়, প্রেমিক অভেদ হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায়। তখন আনন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

২৪০। যখন যে ভাবে মা রাখবেন, জানবে তাই তোমার মঙ্গলের জন্যে – তুমি বোঝ আর নাই বোঝ। সুখ, দুঃখ, সবই তার পদ্মহস্তের মঙ্গল স্পর্শ। তাঁর লীলা কে বুঝবে। সুখে রাখুন, দুঃখে রাখুন, সবই তার আশীর্বাদ বলে ঘাড় পেতে নেবে

মার কিল-চাপড়ও মিঠে, যত পড়ে পড়ুক না পিঠে।
এ ধারণা যদি থাকে ঘটে, শাবাশ, মায়ের ছেলে বটে॥
মায়ের মারে ছেলে মরে না, মার ভ্রুকুটিতে সে ডরে না।
মা যেমন রাখে তেমনি থাকে, মা বইতো সে কিছু জানে না॥

২৪১। রতিপ্রমাণ ঘোলাটে বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রচর্চা, তর্ক, বিচার, যুক্তি দিয়ে ভগবানকে কিই বা বুঝবে? বরং এ সব দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে গুলিয়ে গিয়ে শেষটা এমন তালগোল পাকিয়ে যাবে যে

নিজের অস্তিত্বেই সন্দেহ হবে। এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়ে আমপাতা গুণে ও তার উপর অদ্ভুত গবেষণা করে দিন কাটবে, না, আম খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে? যারা ওসব করে করুক, পোদো তোর ও-সবে কাজ কি, তুই পেট ভরে আম খা।

২৪২। অবশ্য জ্ঞানচর্চা, বিচার, যুক্তি, গবেষণাদির দ্বারা বুদ্ধি মার্জিত হয়, অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায়, অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার হয়, যার দ্বারা জগতের যথেষ্ট কল্যাণ হয়। আবার সেই সব জ্ঞান ও বিদ্যা স্বার্থপর, ইহকালসর্বস্ব লোক বা জাতের হাতে পড়ে জগতের অশেষ দুর্দশা ও লোকক্ষয়ের কারণ হয়, মানুষ হিংস্র পশুতে পরিণত হয়, জগৎ সাক্ষাৎ নরককুণ্ড হয়।

২৪৩। প্রার্থনা হচ্ছে অন্তর্যামীর কাছে অন্তরের বেদনা ও অভাব ভাবে বা ভাষায় জানানো, ও তা মোচন করবার জন্যে কাতরভাবে তাঁর করুণা ভিক্ষা করা। সে প্রার্থনা সকাম, যাতে বলে, "হে প্রভু, আর সংসারের যাতনা, রোগ, শোক, অভাব, অনটন সইতে পারি না,তুমি আমার এ সব দূর করে দাও।" নিষ্কাম প্রার্থনা হচ্ছে, "হে প্রভু, তোমার যত ইচ্ছা আমার ঘাড়ে ভার চাপাও, দুঃখে রাখ, বিপদে ফেল, তাতে কিছু এসে যায় না; কেবল আমায় এইটুকু শক্তি সামর্থ্য দাও যাতে আমি কিছুতে বিচলিত না হই, যাতে আমি তোমায় না ভুলি, যাতে তোমার অভয় পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

২৪৪। ভগবানলাভ বা মোক্ষ মনুষ্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পরম-পুরুষার্থ লাভ করবার অধিকার ও সামর্থ্য কেবল মানুষেরই আছে – পশু বা দেবতা, গন্ধর্ব, কারও নেই। পশুদের নেই কারণ তারা বিবেক-বুদ্ধিহীন। দেবাদির মোক্ষলাভ অসম্ভব, কারণ নিরতিশয় সুখ ও সম্পদে তাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে, বিবেক-বৈরাগ্যের অবসর কোথায়! সেই কারণেই আবার মানুষের মধ্যে যারা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী তাদের পক্ষেও মোক্ষলাভ কঠিন। আর যারা অত্যন্ত গরীব, যারা ক্ষুধার জ্বালায় ও অভাবের তাড়নায় সর্বদা অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত তাদেরও ধর্মলাভ হয় না। ভগবানলাভ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে সম্ভব, কারণ তাদের অবস্থা ওই দুইয়ের মাঝামাঝি। আর দেখা যায়, জগতের ইতিহাসে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ও চিন্তার রাজ্যে যেসব শক্তিমান্ মনীষী নিজেদের প্রতিভাবলে অক্ষয়কীর্তি ও প্রভাব রেখে গেছেন তাঁদের প্রায় অনেকেরই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্ম।

২৪৫। যদি আমরা আসছে কালের ব্যাপার নিয়ে আজকের দিনটা খেয়াখেয়ি করে কাটাই, তাহলে কালকের দিনটাও খুইয়ে বসি।

২৪৬। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, শাস্ত্রজ্ঞান, তর্ক, বিচার, দান, পুণ্য, যাগ-যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা – কিছুতেই ভগবানকে পাওয়া যায় না, তিনি ধরা দেন না। তাঁকে ধরবার, বশ করবার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র – প্রেম, ভক্তি। "তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।" সেইখানে আঘাত করলে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়, তিনি নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারেন না। যেমন দুধেল গাইয়ের বাঁটে বাছুর ঢুঁ মারলে সে হুড় হুড় করে দুধ ছেড়ে দেয়।

২৪৭। বেদে পরমেশ্বরকে সমস্ত গুণের অতীত, নাম-রূপ-দেশ-কাল-নিমিত্তাদি পরিচ্ছেদ-বর্জিত, বাক্যমনবুদ্ধির অগোচর, সর্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্যস্বরূপ বলেছে। কিন্তু ভক্তের প্রাণ তা মেনে নিয়ে নিরস্ত হতে চায় না, – পারে না। ভক্ত বলে, পরমেশ্বর যদি কেবল তাই হন, তা হলে তিনি থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? তাঁর যদি দর্শন না পেলুম, তাঁকে যদি আপনার করতেই না পারলুম, তা হলে ধর্মকর্ম সব মিছে, আমিও মিছে, জীবনধারণও মিছে। তা কি কখন হতে পারে? তাঁকে এই জন্মেই পেতে হবে। ভক্তের অন্তরের আকুল ক্রন্দন পরমেশ্বরের আসন টলিয়ে দেয়, তখন তিনি আর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বান্তর্যামী, অহেতুক-দয়াসিন্ধু, আর সর্বোপরি ভক্তবৎসল। তাই তিনি ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্যে নিজের আসল স্বরূপ গোপন করে তার আকাঙ্ক্ষিত-রূপে হৃদয়-মন্দিরে দর্শন দিয়ে তাকে কৃতার্থ করেন। আবার জীব যাতে তাঁর স্বরূপ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সেইজন্যে তিনি কখন কখন নরদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তখন পাপীতাপী পর্যন্ত তাঁর কৃপায় সাধনভজন বিনা উদ্ধার হয়ে যায়।

২৪৮। ভগবান সাধকের প্রতি কৃপা করে ও তার

আরাধনার সুবিধার জন্যে রূপ ধারণ করেন। তাঁর গুণাতীত অচিন্ত্য-স্বরূপে, অথবা কেবল সমস্ত ঐশ্বরিকগুণের সমষ্টিভাবে তাঁকে ধারণায় আনা সম্ভব নয়। অনেক সময় আমরা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে বসি! আমরা যতদিন মানুষ-পর্যায়ে আছি, ততদিন আমাদের দেহবুদ্ধি বা দ্বৈতভাব আছে, ততদিন ভগবানকে একটি অশেষ-ঐশ্বরিকগুণান্বিত আদর্শ মানুষ রূপে ভাবা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই।

২৪৯। নিরাকার ভাবে পরমেশ্বরকে ডাকতে গেলে আমরা বড়জোর বিরাট আকাশ বা অসীম সমুদ্রের কল্পনা করতে পারি। প্রথম অবস্থায় নিরাকারের ধ্যান করতে গেলে আমরা শূন্যেরই ধ্যান করতে পারি। তাতে অন্য কিছু আরোপ করা যায় না – অন্ধকারে ঢিলছোড়ার মতো আর কি। নিরাকার পিতা বা নিরাকার মাতার ধ্যান কষ্টকল্পনা – একটা অর্থহীন কথার কথা মাত্র। নিরাকার ধ্যানে আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বড় বেশী এগুতে পারি না, কারণ উহা নীরস, অবলম্বনহীন। সর্বরূপাতীত নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানের অধিকারী একমাত্র দেহজ্ঞানশূন্য মুক্ত পরমহংস, যিনি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন।

২৫০। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "সাধুদের পরিত্রাণ, দুর্জনদের বিনাশ ও ক্ষয়োন্মুখ ধর্মের সংস্থাপনের জন্যে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" কিন্তু "এহ বাহ্য, আগে কহ আর" আছে। পরমেশ্বর তো সর্বশক্তিমান, তিনি মানুষ-শরীর ধারণের অশেষ ক্লেশ সহ্য না করেও ইচ্ছামাত্রেই এই সব সম্পাদন করতে পারতেন। তাঁর অবতারত্ব সম্বন্ধে এইটিকেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে নেওয়া যায় না। ধর্মদ্বেষী, অত্যাচারী কংস ও শিশুপালকে বধ করেছিলেন বলেই তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলা যায় না। জগতের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যাতে ওই রকম অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করে প্রজাদের দুঃখের শান্তি করা হয়েছে। অলৌকিক ঘটনাও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবনে অনেক দেখা যায়, তাঁদের অসাধ্য কিছুই নেই। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব তাঁর মথুরা বা দ্বারকার রাজা রূপে অথবা কুরুক্ষত্রে পাণ্ডবসহায়রূপে কার্যাবলীর দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। সে সব করতে গিয়ে তাঁকে অনেক সময় কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাঁর ওই সব অদ্ভুত কার্য অবশ্য আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেয়। কিন্তু ওগুলি সময়োপযোগী ব্যাপার মাত্র। তাদের সুদূরপ্রসারী কোন স্থায়ী প্রভাব মানুষের জীবনে দেখা যায় না।

২৫১। শ্রীকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ কমাত্র বৃন্দাবনলীলাতেই প্রকট হয়েছে। কারণ তাতেই তিনি তাঁর অনির্বচনীয় প্রেম-স্বরূপতার মূর্ত লীলা দেখিয়ে গেছেন। শুদ্ধাভক্তি ও প্রেমে ভগবান কত ভক্তাধীন হন এবং তিনি ভক্তকে কতখানি আপনার করে নিতে পারেন ইহা তাঁর বৃন্দাবনলীলাতেই সব চেয়ে বেশী করে বোঝা যায়। যে প্রেমের ধারণা করা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য, যার আকর্ষণে ব্রজগোপীরা যমুনা-পুলিনে তাঁর বংশীধ্বনি শুনে লজ্জা, ভয়, কুল, মান তুচ্ছ করে উন্মত্তের মতো তাঁর দর্শন ও সঙ্গলাভের আশায় ছুটতো ও তাঁকে পেয়ে অহংজ্ঞান ও দেহবুদ্ধি হারিয়ে তাঁতে তন্ময় হয়ে যেতো, সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা তিনি ওই লীলায় জগৎকে দেখিয়ে গেছেন – যা ভগবান ছাড়া মানুষে সম্ভব নয়। সে অপূর্ব নিত্যলীলার মধুর আধ্যাত্মিক প্রভাব যুগ যুগান্তর ধরে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়কে আকর্ষণ করে এসেছে, তাঁকে ইষ্টজ্ঞানে আরাধনার ভেতর দিয়ে তাদের প্রাণে শান্তি ও আনন্দ দিয়ে এসেছে, এবং তাদের মোক্ষের অধিকারী করেছে। সেই প্রেমের ভাবই আবার উ জ্জীবিত করতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বহুযুগ পরে অবতার হয়ে এসেছিলেন, এবং রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে র সেই কামগন্ধবর্জিত মধুর লীলায় মহাভাবে আত্মহারা হয়ে জগৎকে শুদ্ধাভক্তি ও প্রেম বিলিয়ে গেছেন। আর সে দিন আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই, তিনি রাধাকৃষ্ণের মধুরভাবের গান বা কথা কইতে এমন মহাভাবে আত্মহারা হয়ে যেতেন যে তাঁর অঙ্গে শ্রীরাধার ও শ্রীচৈতন্যের মতো অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেতো।

২৫২। যার যা আছে সে তাই ত্যাগ করতে পারে, যা নেই তার আবার ত্যাগ কি? কোন বস্তু বর্জন করতে হলে তা আগে অর্জন করতে হবে। তার দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করলে চলবে না, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" করলে চলবে না। শাস্ত্র ভোগ করতে নিষেধ করছেন না; বলছেন, ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, অর্থাৎ মমতা ও আসক্তি ত্যাগ করে ভোগ কর। জগতের সকল বস্তুই ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত,

তিনি প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্যুত রয়েছেন, সবই তাঁর — এই জ্ঞানে 'অহং মম' — ভাব ত্যাগ করে সব কাজ কর, সব কিছু ভোগ কর, নচেৎ ভোগ দুর্ভোগে পরিণত হবে। এ ভাবে ভোগ করলে যোগ আপনা হতেই আসবে, আপনা হতেই হয়ে যাবে।

২৫৩। ইষ্টবস্তুকে স্মরণ-মনন করা মানে তাঁর সঙ্গে মনের যোগ স্থাপন করা। সেই চিন্তাধারা যত গাঢ় ও একটানা হবে, চিত্তবিক্ষেপকর বৃত্তিগুলি যত শান্ত হবে, ততই সেটা তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন হবে। তাকেই ধ্যান বলে। সেই ধ্যান আরও গাঢ় হলে ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়, তদাকারকারিত হয়ে যায়। সে অবস্থাকে সমাধি বলে। তখনই স্ব-স্বরূপের পূর্ণ অনুভূতি হয়, ইষ্টদর্শন বা ভগবানলাভ হয়। তখনই, উপনিষদ্ বলছেন, হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ কামনাদি নষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়, কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় — সকল দুঃখের অবসান হয়। সুতরাং ভগবানলাভের প্রথম ধাপ হচ্ছে স্মরণ-মনন, চিত্তবৃত্তির শান্তভাব; দ্বিতীয় ধাপ — ধ্যান; তৃতীয় ধাপ সমাধি — শেষ ধাপ। একটা ধাপ ডিঙিয়ে আর একটা ধাপে যাওয়া যায় না। অতএব স্মরণ-মননের শেষ পরিণতি ঈশ্বরলাভ।

২৫৪। বার বার আবৃত্তি এবং অভ্যাসের দ্বারা এই স্মরণ-মননকে দৃঢ়ভাবে মনে গাঁথবার জন্যেই জপ, ধ্যান, আরাধনার বিধান। ইষ্টমন্ত্র বার বার অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যহ জপ করবার প্রয়োজন এই জন্যেই। আমরা যে বিষয় নিয়ে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকি বা চর্চা করি তার ছাপ মনের উপর পড়ে। সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে মন থেকে মিলিয়ে গেলেও সূক্ষ্মভাবে, সংস্কাররূপে মনের মধ্যে থাকে, এবং যখন অনুকুল আবহাওয়া পায় তখন অজানিতভাবে মানুষকে কাজে বা চিন্তায় প্রেরণা দেয় — অসৎ সংস্কারগুলো প্রবল হলে, কুভাবে, সুসংস্কারগুলো সদ্ভাবে। তাই দেখা যায় — যারা দুষ্কৃতি তারা ক্রমশঃ আরও বেশী কুকাজে লিপ্ত হয়, আর যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে যত্নশীল তারা সেই পথে দ্রুত এগিয়ে যায়।

২৫৫। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত শক্তি আছে তাদের সমষ্টি সব সময়ই একরকম থাকে, তার ক্ষয়বৃদ্ধি বা বিনাশ নেই, তবে তার বিকার বা পরিণাম আছে — সেটা নানাভাবে রূপান্তরিত হয় মাত্র। আমরা যা কিছু ভাল মন্দ কাজ বা চিন্তা করি না কেন, তার কোনটিই নষ্ট হয় না, সূক্ষ্মভাবে তাদের ক্রিয়া চলতে থাকে অথবা সেগুলো সঞ্চিত থাকে, যোগাযোগ হলেই কার্যকর হয়, অর্থাৎ তাদের ফল, ভাল মন্দ আমাদেরই ভুগতে হয়। শুধু তাই নয়, অন্যকেও সেগুলো প্রভাবান্বিত করে ভোগায়।

২৫৬। স্বামিজী বলেছেন, আমরা যতরকমের ক্রিয়াশক্তি বা চিন্তাশক্তি জগতে ছড়াই, সেগুলো বিশ্বাকাশে তরঙ্গাকারে পরিভ্রমণ করতে করতে সেই ভাবের স্পন্দন যে লোকের মধ্যে পায় তার উপর কার্য করে, তাকে সেই ভাবের প্ররোচনা দেয় ও শক্তিসঞ্চার করে, এবং তাদের কাছ থেকে নিজেও শক্তিসঞ্চয় করে। আর সেই শক্তিই — তার চক্রগতি পূর্ণ করে উৎপত্তিস্থানে কোন না কোন সময় ফিরে এসে জোরে আঘাত করে। আমরা কারু অনিষ্ট করলে, কাউকে দুঃখ দিলে, কখনও না কখনও, এই জন্মে বা পরজন্মে, আমাদের সেই রকম ফল ভুগতে হবে — এই হল প্রকৃতির নিয়ম।

২৫৭। প্রকৃতির এই অকাট্য নিয়ম জানা না থাকায় কেন যে আমার এরকম ভোগ হল, তার কোন চাক্ষুষ কারণ না পেয়ে অথবা তার কোন অপ্রত্যক্ষ কারণ আমাদের সহজবুদ্ধিতে ধরা যায় না বলে আমরা অদৃষ্টকে বা ভগবানকে দোষ দিই, তাঁকে নিষ্ঠুর বা একচোখা মনে করি! আমরা এমনি মোহে আচ্ছন্ন, নিজের কর্মফল যে নিজেকেই ভুগতে হবে মায় সুদ সমেত, তা কখনও ভাবিই না! এই সব পরিণাম ভেবে সমস্ত কাজ ও চিন্তাকে সংযত করবে, সৎপথে চালিত করবে। সাময়িক সুখ বা লাভের জন্যে কখনও অন্যের দুঃখের বা অনিষ্টের কারণ হবে না। ধর্মপথে অবিচলিত ভাবে চললে দৈবী সম্পদের (গীতা ১৬।১-৩) অধিকারী হবে, চিত্ত শুদ্ধ হবে, ঐশী শক্তির ক্রিয়া অন্তরে প্রত্যক্ষ করবে। তখন এ মন কি মন্দ করতে ইচ্ছা হলেও করতে পারবে না, ঠাকুর যেমন বলতেন এবং তাঁর জীবনের ঘটনায় প্রমাণ করেছেন, "বেতালে পা পড়বে না।" পরম ধার্মিকের লক্ষণই তাই।

২৫৮। অনেকের ধারণা জ্ঞানমার্গ ও যোগসাধন ছাড়া সমাধি হয় না। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে, "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ" — মন্ত্রজপের দ্বারা ইষ্টদর্শন হয়। তার পরই আছে, "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর

প্রণিধানাৎ" এবং আর এক জায়গায় আছে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"। অর্থাৎ ঈশ্বরে মনের একাগ্রতা বা ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া ও তার ফল সমর্পণ করলে সমাধি অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব লিখছেন, "ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ দ্বারা প্রসন্ন হয়ে ইচ্ছামাত্রেই ভক্তকে অনুগ্রহ করেন। কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছার দ্বারাও যোগীর সমাধিলাভ ও তার ফল খুব শীঘ্র হয়ে থাকে।" সুতরাং অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস না করলেও সমাধি হতে পারে। ভগবানে তন্ময়ত্বলাভ ও সমাধি – একই কথা, কেবল ভাব ও উপায়ের পার্থক্য, বস্তুলাভ ও তার ফল উভয়ের একই। যিনি নিখুঁত ব্রহ্ম তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। তবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই দেহবুদ্ধি জীবের পক্ষে সহজ।

২৫৯। সকাম উপাসনা নিজেরই উপাসনা, ভগবানের নয়। আধিব্যাধি, আপদ-বিপদ, অভাব, দুঃখ,ভয়, ভাবনা, শোক – এ সব থেকে পরিত্রাণের জন্যে ভগনাবকে ডাকা নিজেরই ভুক্তি ও পুষ্টির জন্যে, সুখ-সুবিধার জন্যে মাত্র। স্নান-দান, পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, যাগ-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, তীর্থভ্রমণ, সাধুসেবা, চণ্ডীপাঠ – সকামভাবে এসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয়। পাপক্ষয়, অর্থাৎ কৃত পাপকর্মের কুফল যে নরকভোগ বা দুঃখভোগ, তা থেকে সহজ উপায়ে যাতে বাঁচা যায় তার জন্যে – পাপ-প্রবৃত্তির ক্ষয়ের জন্যে নয়। পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্য – এ জীবনে আত্মীয় পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকা ও পরকালে স্বর্গের অক্ষয় সুখভোগ। এই দুই-ই মনের ভ্রম – বৃথা আকাঙ্খা। অবিমিশ্র সুখ এ জগতে নেই, আবার স্বর্গের সুখও অক্ষয় নয়। ও সব শাস্ত্রের – বেদ-পুরাণাদির – অর্থবাদ, অর্থাৎ স্তোকবাক্যমাত্র। যাদের ধর্মকর্মে প্রবৃত্তি নেই তাদের প্রলুব্ধ করবার জন্যে বলা হয়েছে – একগুণ কর, কোটিগুণ ফল পাবে। মা যেমন শিশু সন্তানকে আজগুবী গল্প ছাড়া শুনিয়ে ভুলিয়ে দুধ খাওয়ায় বা ঘুম পাড়ায়, সেই রকম আর কি। উদ্দেশ্য ভাল, কাজও হাসিল হয়।

২৬০। তবে ওসব উপাসনা সকাম বলে করবো না? করতে কে বারণ করছে? যতদিন প্রাণ চাইবে খুব করবে বইকি। ওসবে চিত্তের প্রসার ও প্রসন্নতা হয়, সৎচিন্তা ও সৎকার্য অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, ধর্মকর্মে বিশ্বাস ও আকর্ষণ হয়। তবে জেনে রেখো যে ওগুলো ধর্ম বটে, কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভক্তি নয়। ভক্তিতে বেচাকেনা নেই, দোকানদারি নেই, লাভ-লোকসান খতানো বা ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। আছে প্রাণের দেবতাকে দেহ, মন, প্রাণ, সর্বস্ব অর্পণ, তাঁকে ভালবেসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি – কারণ, তাঁকে ভালবাসলে আর কিছু লাভের বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না – ভালবাসার জন্যেই ভালবাসা, ভালবাসাই স্বভাব, তাঁকে না ভালবাসলে প্রাণে বাঁচি না, এই ভাব। এই হল ভক্তির পরাকাষ্ঠা – পরা, শুদ্ধা, নিষ্কাম প্রেম ভক্তি। তবে এ ভক্তি অতি বিরল, এ প্রথম থেকে আপনি আসে না। তাই কর্মকাণ্ডের, বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান শাস্ত্রে বিহিত আছে। সেই সব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে পালন করলে ঈশ্বরের কৃপায় ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের ময়লা কাটে, স্বল্পফলের স্পৃহা তুচ্ছ বোধ হয়, অনিত্য বিষয়ে বিরাগ আসে। অক্ষয় পরমপদ প্রাপ্তির জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়। সেই অবস্থাকে পরাভক্তি বা পরম জ্ঞান বলে।

২৬১। দ্বাদশবর্ষ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ও সত্য পালন করলে বাক্‌সিদ্ধ হয়, ঐশীশক্তির বিকাশ হয়। এ রকম লোকের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, যাকে যা বলেন তাই ফলে যায় – অভিশাপ বা আশীর্বাদ, যাই হোক না কেন। তিনি যার মঙ্গলচিন্তা করেন তার মঙ্গল হয়। তাঁর শুদ্ধ মনে যে সঙ্কল্প ওঠে তাই সিদ্ধ হয়।

২৬২। যারা ভগবানকে লাভ করতে চায় তাদের কোন অবস্থাতেই সত্যকে ত্যাগ করতে নেই, তার ফলে হাজার দুঃখকষ্টও যদি ভোগ করতে হয় সেও ভাল। তবেই তো সত্যস্বরূপ ভগবানকে পাবে। সত্য খোয়ালে ভগবানকেই খোয়ানো হল। সত্যের শক্তি অমোঘ। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রাম বনে গেলেন, পঞ্চপাণ্ডব সত্যরক্ষার জন্যে দ্রৌপদীর সঙ্গে নির্বাসন বরণ করলেন, রাজা হরিশচন্দ্র সর্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হলেন। পুরাণে সত্যনিষ্ঠার আরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে, জীবন বিসর্জন দিয়েও। আমাদের ঠাকুর মা-কালীকে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্মাদি সমস্ত দিতে পারলেন, কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলেন না, কেন না সত্য দিলে কি নিয়ে থাকবেন, বলেছিলেন।

২৬৩। সময় হু-হু করে চলে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। জীবন মানেই মৃত্যু। শরীর কখন

যাবে তার কিছুই ঠিক নেই। তাই মৃত্যুর জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। মিছে সময় নষ্ট করো না, কোন অবশ্যকর্তব্য কাজ ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে দিও না। পরলোকের জন্যে সম্বল এখন থেকেই করতে হবে, ধনসম্পদ ইহকালেরই সম্বল, সঙ্গে যাবে না। সাধনভজন পরকালের সম্বল, সেইটিই নিজস্ব জিনিস, যা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। যতটুকু করবে ব্যর্থ যাবে না, ততটুকু পথই এগিয়ে থাকবে।

২৬৪। এ জন্মে সাধনভজন করে যা লাভ করবে, পরজীবনে সেইখান থেকেই শুরু করবে ও দ্রুত অগ্রসর হবে। তাই দেখা যায় কারও কারও স্বভাবতঃ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ; তাদের চিত্তের একাগ্রতা ও সূক্ষতত্ত্বের অনুভূতি একটু সাধনভজন করলেই হয়, একটু উসকে দিলেই প্রকট হয়। এই উসকে দেওয়াই দীক্ষা। ঠাকুরও তাদের শুকনো কাঠ বলতেন – যারা একটি ফুঁ দিলেই জ্বলে ওঠে। আর যারা ভিজে বা কাঁচা কাঠ তারা সহজে চিতুতে চায় না। এজন্যে গুরুকে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। তাদেরও অনেক খাটতে হয় এবং দেরী হয়। তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হয়তো অনেক জীবন কেটে যায়।

২৬৫। কর্মফল ভোগ সকলকেই করতে হয়, ভোগ শেষ না হলে মুক্তি হয় না। তবে অবতার মহাপুরুষদের আশ্রয় নিলে তাঁদের কৃপায় সাতজন্মের ভোগ একজন্মেই কেটে যায়।

২৬৬। জগতে সচরাচর দেখা যায়, যারা ধর্মপথে চলে তাদের সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের পরিসীমা নেই, আর যারা অধর্মের আশ্রয় নেয়, তাদের অনেকে বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটায়। তাদের ভোগবাসনা খুব প্রবল বলেই ভোগই তাদের সর্বস্ব। যে কোন উপায়ে তাই ভোগের বস্তু লাভ করতে পারলে তারা মনে করে আমরা খুব বুদ্ধিমান, আমরা বেশ আছি। বিষ্ঠার কীট বিষ্ঠাতেই সুখ পায়, তাতেই পুষ্ট হয়। কিন্তু তারা এমনই মূঢ় যে ভাবে না, এই যে দুষ্কর্মের বোঝা সঞ্চয় করছি, এর ফলে পরজন্মে কী ভীষণ দুঃখ ভোগ করতে হবে, হয়তো পশুযোনিতে জন্ম নিতে হবে। সে কথা ছেড়ে দিলেও যারা এ রকম ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, যারা বিবেকের বৃশ্চিকংশনে জর্জরিত না হয়, তারা তো নরপশু।

২৬৭। যারা স্বার্থান্ধ, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও ধনমদমত্ত, তাদের বাইরে যতই চাকচিক্য ও প্রফুল্লতা থাকুক না কেন, মনেও করো না যে, তাদের অন্তরে সুখ শান্তি আছে। বিষয়ভোগ কিছুকাল মধুর বোধ হলেও পরে তাই অন্তর্দাহের কারণ হয়, এবং অহরহঃ ভয়, ভাবনা, অশান্তি ও ব্যর্থতায় তাদের জীবন ভারাক্রান্ত হয়, এমন কি তারা মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে বা আত্মহত্যা করে। তারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র।

২৬৮। সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ ও সৎকাজের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখনই মন স্থির ও জপধ্যানে একাগ্রতা আসে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনি মন মলিন থাকলে ভগবদ্ভাব ধারণা করবার সামর্থ্য হয় না। সেই জন্যে সাধনভজন এ কান্ত দরকার। তাতে মন না লাগলেও প্রথম প্রথম জোর করেও করতে হয়। অভ্যাস করতে করতে দেখবে তার স্বাদ পাবে, সেটা ভাল লাগবে। ওষুধ খেতে না চাইলে রোগীকে বুঝিয়ে এমন কি, জোর করেও খাওয়াতে হয়। তবে এমন রোগীও আছে যারা ওষুধ মুখে দিলেও বার করে দেয়। তাদের রোগ সারবে কি করে!

২৬৯। যত সাধনভজন করবে ততই ভগবানের কৃপা বুঝতে পারবে, ততই তাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করবে। দেখবে তিনি তোমায় কত রকমে সাহায্য করছেন, তাঁকে পেতে হলে যা কিছু দরকার তিনিই অন্তরালে থেকে সমস্ত যোগাচ্ছেন। তিনি আকর্ষণ না করলে তাঁর দিকে কি মন যায়? যে ঐকান্তিক ভাবে তাঁকে চায়, তাঁর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে, তিনি তার হৃদয়ে এমন প্রেরণা সঞ্চার করেন যাতে তাঁকে পাবার জন্যে তার প্রাণ ব্যাকুল হয়, অন্য কিছু আর ভাল লাগে না। সে অবস্থাকে প্রেমোন্মাদ বলে। ব্যাকুলতা তারই স্বরূপ। ব্যাকুলতা তাঁর অন্দরমহলের চাবিকাঠি।

২৭০। দিনকতক জপধ্যান করে মনে করো না, কই এত করলুম, কিছুই তো হল না! যদি অনেক দিন করেও কোন ফল না পাও, জানবে কোথাও গলদ আছে, কোথাও ফাটা বা ফুটো আছে যেখান দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নিজের ভেতর অনুসন্ধান করে সেটা বার করবে ও তাকে বুজিয়ে দেবে। তবে তো কলসী ধীরে ধীরে ভরবে, অন্তর শক্তি ও আনন্দে ভরে যাবে। আমি এত করছি, অত করছি, এ সব মনে করা মূঢ়তা, অহংকারের চিহ্ন। বরং ভাববে,

"আমি যতই করি না কেন, তোমায় পাবার পক্ষে সে আর কতটুকু? আমার নিজের কি সাধ্য আছে যার জোরে তোমায় পেতে পারি? তুমি যদি নিজ-গুণে আমায় কৃপা কর তবেই হবে, আমার আর অন্য উপায় নেই, আমি তোমার একান্ত শরণাগত, আমায় নিজগুণে দয়া কর, রক্ষা কর, আমায় ভববন্ধন হতে তরাও।"

২৭১। ধ্যানজপের অভ্যাস সব সময়, সব জায়গায় এবং সব অবস্থাতেই করা যেতে পারে। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষরা তাঁদের মনকে ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে লোকের হট্টগোলের মধ্যেও এমন নির্জনতা অনুভব করেন যে কিছুতেই তাঁদের একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না।তাঁরা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, নিন্দা-স্তুতিতে সমভাবে অবস্থিতি করেন। তাঁদেরই গীতায় স্থিতধী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলা হয়েছে।

২৭২। তেমনি, জপে যাঁরা সিদ্ধ হন তাঁদের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে স্বতই জপ হতে থাকে, চেষ্টা করে করতে হয় না। তাকেই অজপা জপ বলে। অভ্যাসবশে জপে মন দৃঢ় হওয়ার ফলে তাঁদের এমন অবস্থা হয় যে, তাঁরা বাইরে কথাবার্তা বা কাজকর্ম নিয়ে থাকলেও তাঁদের অন্তরে ইষ্টমন্ত্র অনবরত ধ্বনিত হতে থাকে। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্যে ইচ্ছা হলে সে সময় মালাও ঘুরিয়ে নেন। তবে বোষ্টুম বাবাজীদের মতো শাকতরকারির দর করতে করতে লোক দেখানো মালা ঠক্‌ঠক্‌ নয়। ধ্যানসিদ্ধ ও জপসিদ্ধ মহাপুরুষের অবস্থা একই রকম। দুই-ই বহুকাল ঐকান্তিক ভাবে অভ্যাস, চিত্তসংযম ও সাধনভজনের চরম ফল। "ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তাঁর ঠাঁই।"

২৭৩। বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে শ্বাস-প্রশ্বাস সমভাবে ও ধীরে নেওয়ার নাম প্রাণায়াম, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম ঠিক ভাবে ধীর্ঘকাল করলে চিত্ত স্থির হয়, এবং ধ্যানকালে যে বস্তুতে তাকে লাগান যায় তাতে একাগ্রতা আসে এবং তার সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। এইটিই প্রাণায়ামের আধ্যাত্মিক ফল। শরীর ও মনের ওপরও এর ক্রিয়া অদ্ভুত। এতে শরীর সুস্থ, সবল ও কান্তিমান্‌ হয়। মনও প্রফুল্ল, ধৈর্যশালী, বীর্যবান্‌ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, আর প্রবল ইচ্ছাশক্তির ও আকর্ষণী শক্তির (will power and personal magnetism) বিকাশ হয়। সুতরাং যে কাজে তাকে নিয়োগ করা যায় তা সিদ্ধ হয়। প্রাণায়ামের ফলে যোগীরা দীর্ঘজীবী হন ও তাঁদের নানা অলৌকিক সিদ্ধাই হয়; কিন্তু সেগুলি পরমার্থ প্রাপ্তির মহাবিঘ্নস্বরূপ।

২৭৪। জগতে দেখা যায়, যে সব জীবজন্তুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যত ধীরে ধীরে বয় তারা তত দীর্ঘায়ু হয়, আর যারা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে তারা স্বল্পায়ু। পুরাকালে স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করার ফলে মানুষ সাধারণতঃ একশো বছর বাঁচতো। বেদের মতে শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ।

স্বরোদয় যোগশাস্ত্রমতেঃ

মানুষ পুরাকালে প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাস নিতো ১২/১৩ বার, বাঁচতো ১০০ বৎসর, (এখন ১৫/১৬ বার)।

	প্রতি মিনিটে শ্বাস নেয়	বাঁচে ~
হাতি	১১/১২ বার	১০০ বৎসর
সাপ	৭/৮ বার	১২০ বৎসর
কচ্ছপ	৪/৫ বার	১৫০-১৫৫ বৎসর
বাঁদর	৩১/৩২ বার	২০/২১ বৎসর
খরগোস	৩৮/৩৯ বার	৮ বৎসর

২৭৫। বায়ু সবেগে পরিত্যাগ করা নিষেধ। এতটুকু জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে যেন হাতে রাখা ছাতু তাতে উড়ে না যায়।

২৭৬। যারা উপযোগী শিক্ষাদীক্ষা ও সাধন ছাড়া মনকে প্রথম থেকেই শূন্য করবার চেষ্টা করে ও ভাবে যে মনকে সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন করে নির্বীজ সমাধিরূপ উচ্চাবস্থার সাধন করছে, তারা নিজেদের তমোগুণেই নামিয়ে আনে, অর্থাৎ জড় ও মূঢ়স্বভাব করে কেলে। তাদের মস্তিষ্ক খালি হয়ে যায়, তারা সূক্ষ্ম বিষয় ধারনা করতে অক্ষম হয়।

২৭৭। শিবসংহিতা-মতে যোগে সিদ্ধিলাভের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে – আমি নিশ্চয়ই সফল হব এই বিশ্বাস। দ্বিতীয়, শ্রদ্ধাপূর্বক সাধন; তৃতীয় গুরুপূজা; চতুর্থ সমতা; পঞ্চম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; ষষ্ঠ হচ্ছে পরিমিত আহার। সপ্তম বলে আর কিছু নেই। অর্থাৎ এই কয়টি ঠিক ঠিক হলে সিদ্ধি অবধারিত। সকল মুমুক্ষুর পক্ষেই এটি প্রযোজ্য।

২৭৮। মানুষের মনকে বশ করার মতো কঠিন কাজ

আর দুনিয়ায় নেই। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বলেছিলেন, "বরং কেউ অনায়াসে সাতসমুদ্র সাঁতার কেটে পার হতে পারে, সমস্ত বায়ুকে শুষে নিতে পারে, পাহাড়গুলোকে নিয়ে বল্ (ball) খেলা করতে পারে, কিন্তু চঞ্চল মনকে বশ করা তার চেয়েও দুঃসাধ্য।" কিন্তু তা না হলেও ভয় পাবার বা, নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। বীর সাধক অসীম অধ্যাবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে ভগবানের ওপর নির্ভর করে প্রাণপণে চেষ্টা ও সাধনা করলে তাঁর কৃপায় অসাধ্য সাধন করতে পারে।

২৭৯। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে এক পত্রে স্বরচিত একটি শ্লোক তাঁর মঠের গুরুভাইদের পাঠিয়েছিলেন। তার দুই পঙ্ক্তি এই :-

কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসো বয়ম্॥

আমরা তারা চিবিয়ে খাবো, জোর করে ত্রিভুবন উপড়ে ফেলবো, তুমি কি আমাদের জানো না? আমরা যে শ্রীরাকৃষ্ণের দাস!" এই রকম প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় ও গুরুভক্তি থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। স্বামীজীর তা ছিল বলে তিনি বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন। যীশুখ্রীষ্টও বলেছেন, "যদি তোমাদের সরষে প্রমাণ বিশ্বাস থাকে ও এই পাহাড়টাকে বল এখান থেকে সরে ওখানে যা, তাহলে নিশ্চয় যাবে, তোমাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু থাকবে না।" শুনেছি, আমাদের ঠাকুর তাঁর নানা অধ্যাত্ম অনুভূতি ও ঐশ্বরিক দর্শনের পর পরীক্ষা করবার জন্যে মাকে বলেছিলেন, "মা, আমার এ সব যদি সত্য হয় তা হলে এই বড় পাথরটা তিনবার লাফাবে।" বলবামাত্র তাই হয়েছিল। এসব কি কথার কথা?

২৮০। শরীরে কি ষট্পদ্ম বাস্তবিক আছে? স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমাদের প্রভু বলতেন যে, যোগীদের বর্ণিত পদ্মগুলি মানুষের শরীরে বাস্তবিক স্থূলভাবে থাকে না, কিন্তু যোগশক্তির প্রভাবে জন্মায় ও তাঁদের গোচর হয়।"

২৮১। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে কর্ম তিন রকম হয়, শুভ বা সৎ – সাত্ত্বিক, অশুভ বা অসৎ – তামসিক, ও ওই দুটির মিশ্রিত – রাজসিক। অন্তঃকরণ না সূক্ষ্মশরীরে কর্মাদির দ্বারা যে দাগ বা ছাপ পড়ে তার নাম সংস্কার। তাকেই আমরা কর্ম, অদৃষ্ট, ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্য ইত্যাদি বলে থাকি। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। আমাদের যা কিছু ভাল মন্দ রুচি বা প্রবৃত্তি, সবই পূর্বসঞ্চিত সংস্কারের উত্তেজনা মাত্র। তাদের মধ্যে সেই গুলিই প্রকাশ পায় বা কার্যকরী হয় যেগুলি অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা পায়; অন্যগুলি সঞ্চিত থাকে – উপযুক্ত যোগাযোগের প্রতীক্ষা করে – ও অবসর পেলে শুভাশুভ ফল প্রসব করে। আমরা যা কিছু করি না কেন, সমস্তই সদসৎ মিশ্রিত, সেই জন্যে সুখ-দুখ মেশানো ফলভোগ হয়। যাতে যেটার পরিমাণ বেশি তাকে সেই নাম দিয়ে থাকি।

২৮২। সকল কর্মই বন্ধনের হেতু। সুখই বল দুঃখই বল, দুই-ই বন্ধন।এ দুইয়ের পার না গেলে মুক্তিলাভ হয় না। কর্ম কেবল তাঁদেরই পক্ষে বন্ধনের হেতু হয় না, যারা অহংবুদ্ধি রহিত হয়ে পরার্থে কাজ করে যান, কারণ তারা ফলাকাংক্ষা করেন না, নিজের স্বার্থসিদ্ধির না নামযশের জন্যে কাজ করেন না। তাঁদের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, তাঁরা সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে তাঁর সেবা হিসেবে কর্ম করেন। তাই তাঁদের সে কর্ম সমস্ত সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করে ও মনে নতুন সংস্কার রূপে কোন কর্মের বীজেরও সৃষ্টি করে না। সুতরাং তারা পুনঃপুনঃ জন্মমরণের কারণ থেকে বিমুক্ত হয়ে দেহত্যাগের পর মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকারী হন।

২৮৩। ভোগে সুখ নেই, সুখ একমাত্র ত্যাগেই আছে। যে সদসৎ বিচারের দ্বারা অথবা ভুগে ভুগে শিক্ষালাভ করে, বিষয়ভোগকে অসার ও পরিণামে দুঃখদায়ী জেনে তাতে বীতরাগ হয়ে স্বেচ্ছায় সমস্ত ত্যাগ করে, সেই-ই পরম সুখী, সেই-ই অমৃতের অধিকারী হয়। তাঁর 'ভক্তিযোগে' স্বামীজী দেখিয়েছেন, এই ত্যাগই চতুর্বিধ যোগের প্রাণ।

২৮৪। কর্মযোগী 'ঈশ্বরই কর্তা, আমি অকর্তা' জেনে কর্মের ফলে আসক্ত না হয়ে তা ভগবানকে অর্পণ করেন। রাজযোগী জানেন, প্রকৃতি পুরুষের জন্যে, পুরুষ প্রকৃতির জন্যে নন; পুরুষ আত্মা, প্রকৃতি জড়; সুতরাং তিনি প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তাঁদের সম্বন্ধ সাময়িক, অর্থাৎ চিরন্তন নয়। পুরুষ প্রকৃতির অধীন নন। তিনি প্রভু, প্রকৃতি দাসী; তাঁর কার্যসাধনের জন্যে প্রকৃতি। প্রকৃতির কার্য হচ্ছে তাঁকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর যথার্থ স্বরূপ

উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া। তাই রাজযোগী প্রকৃতিকে অনাত্ম জ্ঞানে তার মোহ ত্যাগ করেন।

২৮৫। জ্ঞানযোগীর ত্যাগ সবচেয়ে কঠিন। কেননা তাঁকে প্রথম থেকেই ধারণা করতে হয় যে, সমস্ত জগৎ ও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ মিথ্যা, মায়া – সমস্ত জীবনটা স্বপ্নবৎ। তাঁর পথ 'নেতি, নেতি'; আমি এ নই, ও নই; আমি দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নই; আমার সুখ নেই, দুঃখ নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বন্ধন নেই, মুক্তি নেই; আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা। সেইজন্যে তিনি সমস্ত বাহ্যবিষয় ত্যাগ করে স্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হন।

২৮৬। ভক্তিযোগীর ত্যাগ সবচেয়ে সহজসাধ্য, – স্বাভাবিক ভাবে আসে। এতে কঠোরতা নেই, মনকে জোর করে দমন করবার বৃথা আয়াস নেই, কেবল মনের বৃত্তিগুলির মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়, তাদের স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে হয়। জগতের নানা বস্তুতে আসক্ত হয়ে অবিরত দুঃখ শোক ও নৈরাশ্য ভোগ করে মানুষ যখন তাদের অসারতা উপলব্ধি করে বীতস্পৃহ হয়, তখন সে সবে তার আসক্তি আপনা হতে খসে যায় ও নিত্যসত্য পরমসুখাস্পদ পরমেশ্বরকে লাভ করবার জন্যে মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হয়, হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়। ঠাকুর তাই কলিতে ভক্তিমার্গ প্রশস্ত বলেছেন।

২৮৭। যাঁর জীবনে কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ, জগদ্‌গুরু। সার্বজনীন ধর্মের এই নতুন আদর্শ ঠাকুর আপনি আচরণ করে জগৎকে দিয়ে গেছেন। এইটিই যুগধর্ম।

২৮৮। ত্যাগ ছাড়া যেমন যোগ হয় না, তেমনি ভোগও হয় না। ত্যাগ ছাড়া ভোগ দুর্ভোগ মাত্র, কেবল ভোগান্তিই সার হয়। ত্যাগের নাম শুনলেই লোকে ভয়ে পালায়। তারা ধারণা করতে পারে না যে ত্যাগে কত সুখ। ত্যাগ করতে বললে যে স্ত্রীপুত্র, প্রিয়জন, বাড়িঘর, ধনসম্পদ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীই হতে হবে তার মানে কি? দৈনন্দিন জীবনে সাধ্যমত একটু আধটু ছোটখাট ত্যাগের অভ্যাস করে দেখ না। তাহলে বুঝতে পারবে ত্যাগে কত সুখ ও আনন্দ, চিত্তের কত প্রসার ও প্রসন্নতা লাভ হয়। যে ত্যাগে আনন্দ দেয় না সে ত্যাগ ত্যাগই নয়, আর কিছু।

২৮৯। ত্যাগই জীবনের জীবন। আমরা প্রতি মুহূর্তে অজ্ঞাতসারে ত্যাগ করছি। জীবনধারণের জন্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি; আহারাদির দ্বারা হৃদপিণ্ডে যেমন রক্তসঞ্চয় হচ্ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শিরায় শিরায় তা সঞ্চারিত হচ্ছে – নচেৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা যা কিছু অন্যের থেকে বা প্রকৃতি হতে পাই, এবং যা কিছু অর্জন করি – বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধন, ধর্ম – তা পরের উপকারের জন্যে, অন্যের অভাব মেটাবার জন্যে। সে সব যদি অকাতরে দান বা বিতরণ করতে বিমুখ হই, তা হলে কালে সেগুলো নষ্ট হয়, কারও কোন কাজে আসে না। – বিতরণ – বিনিময় নয়। দান বা ত্যাগ স্বতঃপ্রণোদিত ও অভিসন্ধিশূন্য হওয়া চাই, তবেই অক্ষয়ফলপ্রসু হয়। "দাও, দাও, ফিরে নাহি চাও যেবা ফিরে চায় তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান" – স্বামীজী বলেছেন।

২৯০। বাহ্য প্রকৃতিতে ত্যাগের ক্রিয়া সর্বত্র দেখা যায়। সূর্য, চন্দ্র, তারা আলো-উত্তাপ দিচ্ছে; গাছ ফল প্রসব করছে, ছায়া দান করছে, এবং ফুল মধু ও সৌরভ বিতরণ করছে; নদী তৃষ্ণা নিবারণ এ বং পৃথিবী প্রাণীদের খাদ্য ও ভোগসামগ্রী উৎপাদন করছে। সকলেই নীরবে নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী জীবের উপকারের জন্যে আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছে। মানুষই কেবল মরবার সময়েও, 'আমার আমার' করে মরে!

২৯১। যোগী ও ত্যাগী পুরুষরা নিজের ভোগের জন্যে কারও দান গ্রহণ করেন না, কারণ তাতে মনের স্বাধীনতা ও পবিত্রতার হানি হয়। দান গ্রহণ করলে বাধ্যবাধকতা আসে ও দাতার পাপ শরীর মনকে কলুষিত করে। আমার এটা হোক, ওটা হোক, এটি চাই, সেটি চাই এই রকম বাসনার অধীন হওয়া ও সে জন্যে দান গ্রহন করার নাম পরিগ্রহ। অপরিগ্রহ – কামনাশূন্য ত্যাগের ভাব। কেবল শরীর রক্ষার জন্যে কিছু কিছু নেওয়াকে পরিগ্রহ বলে না। জ্ঞানীরা সেই সামান্য ভোগটুকুতেও আবার আসক্ত হন না, কারণ তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে ভোগে সুখ নেই, এবং তাঁদের সুখস্পৃহাও থাকে না। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা কোন লোকহিতকর কার্য করেন, তাঁরা সেটি ভাল করে করবার উদ্দেশ্য যদি দান স্বীকার করেন তা দোষের হয় না।

২৯২। নাম ও নামী অভিন্ন, ভগবান ও তাঁর নাম অভিন্ন। তাঁর রূপ, গুণ, ভাবও যেমন অসংখ্য, তাঁর নামও তেমনি অসংখ্য। তাঁর নামের শক্তি অমোঘ ও অনন্ত। যে নামে তোমার রুচি হয় সেই নামই করে যাও। তাতেই তিনি সাড়া দেবেন। কেবল তাঁর নাম জপেই সকল অভীষ্ট পূর্ণ হতে পারে এবং তাঁকে লাভ করা যেতে পারে। "জপাৎ সিদ্ধিঃ।"

২৯৩। কিন্তু গুরুপরম্পরা ভিন্ন বস্তুলাভ হবার নয়। গুরুপরপম্পরায় একটা শক্তি ধারাবাহিক ভাবে গুরু হতে শিষ্যে আসে আবার তার শিষ্যে যায়। আবহমান কাল ধরে এইভাবে নামের আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্ররূপে তাঁদের কঠোর সাধনায় কেন্দ্রিভূত হয়। এই মন্ত্রই সাধকের আশা, আকাঙ্খা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। চিত্তকে একাগ্র করে সেই মন্ত্র নিয়ত জপ করলে তার মাহাত্ম প্রত্যক্ষ হয়। তবে যিনি গুরুপরম্পরায় পেয়েছেন এমন শুদ্ধচিত্ত সাধকের কাছ থেকে যথাবিহিত দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে তাঁর উপদেশ মতো সাধনভজন করলে আশু সিদ্ধিলাভ হয়।

২৯৪। যদি কেউ দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়, তার নাম ধরে ডেকে দরজায় ঘা দিলে সে যেমন জেগে উঠে সাড়া দেয় ও দরজা খুলে দেয়, তেমনি সরল বিশ্বাসে ও ভক্তির আবেগে ইষ্টমন্ত্র জপ ও সাধন করলে সর্বজীবের হৃদয়শায়ী ইষ্টদেবতা জাগ্রত হয়ে হৃদয়মন্দিরের দরজা খুলে দেন এবং সাধককে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন।

২৯৫। তাঁর নামের এমনি অপার মহিমা যে তাঁর নাম নিলে পাপী, তাপী, পাষণ্ড পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যায়, ভক্তিহীনের নামে রুচি হয় ও বিষয়ে অরুচি হয়। আর কিছু সাধনভজন করতে না পার, অন্ততঃ তাঁর নাম করে যাও, তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, মনে বল পাবে, শান্তি পাবে ও তাঁর কৃপায় কালে প্রেমভক্তির অধিকারী হবে।

২৯৬। তপস্যা তিন প্রকারের – কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ব্রতাদি কৃচ্ছসাধন ও আর্তসেবাদি কায়িক তপস্যা। সত্যপরায়ণতা বাচিক তপস্যা। ইন্দ্রিয়সংযম ও ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্রতা সাধন মানসিক তপস্যা। যিনি পরমার্থলাভের প্রয়াসী তিনি এই ত্রিবিধ তপস্যা অবশ্য করবেন।

২৯৭। ধর্ম বলতে ভগবানকে চাওয়া ও তাঁর অভাব বোধ করাকে বোঝায়। সেই জিনিসটারই অভাব আমাদের তীব্র ভাবে বোধ হয়, যা নইলে প্রাণধারণ করা অসম্ভব – যেমন বায়ু এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। আমরা কি সত্যই ভগবানকে সেই রকম চাই? বস্তুতঃ আমরা তাঁকে ছাড়া সব কিছুই চাই, কারণ আমাদের জীবনধারণের জন্যে নিত্যকার যা কিছু সাধারণ অভাব তা বাহ্য জগৎ থেকে পূর্ণ হয়। যখন আমরা এ মন কোন বাস্তুর প্রয়োজন বোধ করি যা তা থেকে সিদ্ধ হবার নয়, যখন অন্তরের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার সাধ্য তার নেই বলে বুঝতে পারি, তখনই আমরা অন্তরের দিকে তাকাই ও সেখানে খুঁজি। যখন আমরা ভুগে ভুগে হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পাই যে, যা কিছু করছি সব ছেলেখেলা, জগৎটা স্বপ্নবৎ মিথ্যা, আপনার বলে যেটাকে ধরতে যাই সেটাই হাত থেকে ফসকে যায় – তখন এমন কোন নিত্য বস্তুর জন্যে প্রাণ ব্যকুল হয়, যাকে পেলে সকল দুঃখ ও অভাবের সমূলে বিনাশ হতে পারে। সে বস্তু একমাত্র পরমেশ্বর। সেই রকম মনের গতি হল ধর্মের প্রথম সোপান – বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবানের জন্যে অভাববোধ।

২৯৮। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা সর্বনাশের কারণ স্বরূপ অধর্মের বংশপরম্পরা এই রকম বলা হয়েছে, – অধর্মের স্ত্রী হল মিথ্যা। তাদের দম্ভ নামে এক পুত্র ও মায়া নামে এক কন্যা হয়। তারা পরস্পরকে বিবাহ করে এবং তাদের লোভ নামে এক পুত্র ও শঠতা নামে এক কন্যা হয়। এদের সম্মিলনে ক্রোধ ও হিংসা উৎপন্ন হয়। কলি তাদের পুত্র এবং দুরুক্তি কন্যা। কলি এই দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নামে এক কন্যা ও মৃত্য নামে এক পুত্র উৎপাদন করে। যাতনা ও নরক তাদেরই সন্তান।

২৯৯। আর চতুর্বর্গলাভের কারণ ধর্মের পরিবারবর্গ এই রকম – শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা ও মূর্তি – এই তের জন ভগিনী হচ্ছে ধর্মের পত্নী। তার মধ্যে শ্রদ্ধা – সত্য, মৈত্রী – প্রসাদ, দয়া – অভয়, শান্তি – শম, তুষ্টি – হর্ষ, পুষ্টি – গর্ব, ক্রিয়া – যোগ, উন্নতি – দর্প, বুদ্ধি – অর্থ, মেধা – স্মৃতি, তিতিক্ষা – মঙ্গল, এবং লজ্জা – বিনয় নামে পুত্রকে

প্রসব করেন, আর সকল পুণ্যের উৎপত্তিস্বরূপা ধর্মের কনিষ্ঠা স্ত্রী মূর্তি – ঐশীশক্তিভূত নর ও নারায়ণ ঋষিকে প্রসব করেন।

৩০০। মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে দ্বন্দ বাধলে হৃদয়ের কথাই শুনবে। মস্তিষ্ক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধান কেন্দ্র। সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি আমরা তা হতেই পাই। হৃদয় হচ্ছে মর্মস্পর্শী সমস্ত ভাব, আবেগ ও অনুভুতির কেন্দ্র। মস্তিষ্কবান্ লোক নানা শাস্ত্র, বিদ্যা ও বিজ্ঞানে পারদর্শী, পণ্ডিত, উপদেষ্টা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কৌশলী ও নানা বিষয়ে দক্ষ হন। হৃদয়বান্ লোক দয়া, উদারতা, পরদুঃখে সহানুভূতি, সর্বজীবে প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হন। হৃদয়ই মানুষকে সর্বোচ্চ ভাবের প্রেরণা দেয় ও আত্মানুভূতির রাজ্যে নিয়ে যায়, যেখানে বুদ্ধিবিচারের প্রবেশের অধিকার নেই। বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রকৃতির হতে পারে, কিন্তু হৃদয়বান্ ব্যক্তি প্রাণ গেলেও কখন সে রকম স্বভাবের হতে পারে না।

৩০১। যত রকমে পার হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন করবে। হৃদয়ই প্রেম-গঙ্গার গোমুখী। হৃদয়ের মধ্য দিয়েই ভগবদ্বাণী শোনা যায়, হৃদয়কন্দরেই তিনি দর্শন দেন। তাঁকে পেতে হলে, জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষলাভ করতে হলে শাস্ত্রজ্ঞান বা বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নেই। বই পড়ে চরিত্রগঠন বা মানুষ তৈরি হয় না – পণ্ডিত-মূর্খই জন্মায়। 'গ্রন্থ নয় গ্রন্থি' – গেরো, বন্ধন – ঠাকুর বলতেন।

৩০২। বিশেষতঃ আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা তো জগা খিচুড়ি, অনেক স্থলেই মানসিক অজীর্ণতা আনে। 'পাস' করা নয়, পাশ গলায় পড়া। কিন্তু হায়, 'পাস' করার কি মোহই না আমাদের পেয়ে বসেছে! জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনের সব মানসিক ও শারিরিক শক্তিটা ওতে লাগাই, অনটন সত্ত্বেও ঐজন্যে কষ্টেসৃষ্টে টাকা যোগাড় করি, কত শারীরিক কষ্ট ও মানসিক উদ্বেগ সহ্য করি – ফল প্রায়ই স্বাস্থ্যনাশ এবং জীবন-সংগ্রামে হেরে গিয়ে চারদিক অন্ধকার দেখা! তার ওপর যদি বাল্যবিবাহের ফলে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের ভরনপোষণও করতে হয় তো সোনায় সোহাগা। বিশ্ববিদ্যালয়কে যে গোলামখানা বলা হয়েছে তা মিথ্যা নয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষা যা দাঁড়িয়েছে তা অর্থকরীও নয়, কার্যকরীও নয় – অনর্থকরী, আত্মঘাতী। নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, ধর্মে শ্রদ্ধাহীন, বিজাতীয় ভাবাপন্ন, জ্যান্তে মরা, তথাকথিত শিক্ষিতদেরই মধ্যে বেশীর ভাগকে দেখা যায়। নেহাত শুভসংস্কার যাদের তারাই বেঁচে ওঠে।

৩০৩। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়ে তাঁকে পাবার চেষ্টা কর, যাঁকে পেলে সব কিছুই পাওয়া হয়ে যায়, পাবার আর কিছু থাকে না। তাঁকে জানবার প্রযত্ন কর, যাঁকে জানলে সকল জিনিস জানা হয়ে যায়, জানবার আর কিছু থাকে না। তাঁকে ভালবাস যাঁকে ভালবাসলে আর সব ভালবাসা – কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি – ছাইপাঁশ বলে মনে হবে। এমন ভাবে জীবন গঠন কর যে মৃত্যুহীন জীবন লাভ করতে পার।

৩০৪। তবে সেই রকম রতিমতি হওয়া চাই। সাধন চাই – ঐকান্তিক কঠোর সাধন। এক ছটাক সাধনও একশো মণ বচনের চেয়ে বেশী। এক বিন্দু প্রেম সমুদ্রপ্রমাণ শাস্ত্র জ্ঞানের চেয়ে বেশী তৃষ্ণা নিবারক। প্রেম হচ্ছে যেন ক্ষীর, সর, মাখন, আর শাস্ত্রাদি অপরা বিদ্যা যেন গোল। বিচার, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বক্তৃতাদি, এ সব নীচের থাকের লোকেদের জন্যে – তারা তাই নিয়ে সুখে থাকুক। যারা ঘোল খেতে চায় খাক, তুমি যত ইচ্ছে ক্ষীর সর মাখন খাও।

৩০৫। পবিত্রতা "সত্যং শিবং সুন্দরম্" - এর চিরতুষারমণ্ডিত কৈলাসধাম। পবিত্র হৃদয়েই তিনি প্রতিভাত হন। পবিত্র হৃদয়েই মহান্ তত্ত্বসকলের স্ফুরণ হয়। এই যে পরমাণুতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব (অর্থাৎ শরীরের ভিতর কি হয়, না হয়, ও তার এদিক ওদিক হলে কি কি রোগ হয়), নক্ষত্রগণের গতি ও ক্রিয়া, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বহু যুগ পূর্বে আমাদের যোগী ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন, তা কি করে সম্ভব হয়েছিল? তাঁদের তো দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, রাসায়নিক উপকরণ-ভরা পরীক্ষাগার (laboratory) ছিল না। তাঁরা শুদ্ধমনের একাগ্র অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে নানা গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলান, যা বর্তমান সভ্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়স্থল।

৩০৬। পরাভক্তি, জ্ঞান জ্ঞান ও মোক্ষলাভের যদি অভিলাষী হও তো অন্তরে বাহিরে পবিত্র হতে হবে। দেহ ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া চাই। তার

উপায়, ঠাকুর বলতেন, 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ'। বিষম কঠিন তবে অসাধ্য নয়। প্রাণপণ চেষ্টা ও অভ্যাস – পুরুষকার ও সাধন দ্বারা সব কাজই সিদ্ধ হয়। পুরুষকারও ভগবৎকৃপা ছাড়া হয় না। 'লক্ষের দুটো একটা কাটে বটে, কিন্তু কে বলতে পারে তুমি সেই 'দুটো-একটা'র মধ্যে নও। এই বিশ্বাসে এগিয়ে চল।

৩০৭। আমরা জ্ঞানপাপী। জেনে শুনে পাপ কাজ করে ভুগি তবু করতেও ছাড়ি না, আবার ন্যাকামির কান্নাও কাঁদি। জ্ঞানপাপী নাস্তিক। পাপীর পরিত্রাণ আছে, কিন্তু জ্ঞানপাপীর মুক্তি নেই। জেগে যে ঘুমোয় তাকে কে জাগাবে! ধর্মলাভ ছেলেখেলা নাকি? মন মুখ এক না করতে পারলে, সর্বতোভাবে সরল না হলে কিছুই হবে না।

৩০৮। চালাকি করে বা ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। বাহ্যাড়ম্বরে ও কথার চটকে লোককে ভুলাতে পার, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কপটতা চলবে না, নিজেই ঠকবে। সাধনভজন সব ফুটো কলসীতে জল ঢালার মতো পণ্ডশ্রম হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও পূর্ণ আত্মোৎসর্গের দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয় ও মহৎ কাজ সাধিত হয়।

৩০৯। নিজে কিছু করবো না বা করতে পারবো না, তুমি যদি করে দাও তবেই হবে – এ সব পুরুষত্বহীনদের কথা। মুখে তুলে ধর তবে খাব, এই ভাব যাদের বা যে সমাজের তাদের মরাই ভাল, আর প্রাকৃতিক বিধানে ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে তারা মরেও যায়। পরমুখাপেক্ষী হয়ে বা কোন দৃষ্ট বা অদৃষ্ট শক্তির সাহায্যের ভরসায় বেঁচে থাকা মৃত্যুর সমান। স্বাধীনতা স্বর্গ, পরাধীনতা নরক।

৩১০। কর্মবাদ মানলে অদৃষ্টবাদী কেন হতে হবে? কর্মবাদ চিরকাল মানুষকে মুক্তির বাণীই ঘোষণা করেছে। যদি আমি কর্মদোষে নিজেকে বন্ধ ও অধঃপাতিত করে থাকি, তো নিশ্চয়ই কর্মগুণে আবার নিজেকে উন্নতও করতে পারব। নিজেকে নিজে যদি বাঁধতে পারি তো নিজেই সে বন্ধন খুলতেও পারি। তফাত শুধু ইচ্ছা ও কর্মে। সৎসঙ্কল্প, সৎকর্ম ও সাধুবৃত্তির দ্বারা অসৎ কর্মপাশ ছেদন করে কেনই বা আমরা মুক্ত হতে না পারবো? যদি কোন কালে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। কেনই বা আমরা আত্মত্যাগ করে সৎকর্ম বা ধর্ম করতে যাব, যদি অসৎকর্মের দ্বারা বেশী লাভবান হতে পারি? তাহলে সমস্ত ধর্মভাব, সাধুভাব, দয়া, প্রীতি জগৎ থেকে লোপ পেয়ে যেত ও মানুষ পশুতে পরিণত হত।

৩১১। ভগবান অনন্তস্বরূপ হয়ে কি করে ক্ষুদ্র সীমা বিশিষ্ট মানুষ-শরীরে অবতীর্ণ হতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, "হাঁ, ভগবান অনন্তস্বরূপ সত্য, কিন্তু তোমরা যে ভাবে ধারণা কর সে ভাবে নয়। তোমরা অনন্ত মানে স্থূলভাবে বোঝ এক অতি বড় বিরাট বস্তু, যা সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে। তাই মনে কর, কি করে এত বড় এ কটা বিরাট জিনিস নিজেকে সঙ্কুচিত করে এই অতি ক্ষুদ্র মনুশ্যশরীরে ঢুকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের আনন্ত্য বলতে তাঁর অসীম আধ্যাত্মিক সত্তাকেই বোঝায়, এবং সেইজন্যে নরদেহে অবতীর্ণ হওয়াতে তা কিছুমাত্র বাধিত হয় না।

৩১২। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মে ও অবতারে কোন পার্থক্য নেই। তবে অবতারে ও জীবে প্রভেদ আছে। মানুষ নিজের কর্মবশে বাধ্য হয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অবতার স্বেচ্ছায় জগৎ রক্ষা, অধর্মের নাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্যে, এ বং সাধু ও ভক্তদের অনুগ্রহকল্পে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আরও, জীবেরা ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অধীন হয়ে জন্মায়; কিন্তু অবতার প্রকৃতির বা ত্রিগুণের অধীন নন – তাদের প্রভু ও নিয়ন্তা। অবতার সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর খোলটাই শুধু নরাকার।

৩১৩। ভগবান বলতে আমরা যা কিছু শ্রেষ্ঠ বা চরম বলে ধারণা করতে পারি, তা অবতারেই মূর্ত দেখতে পাই ও সাম্যক্ উপলব্ধি করি। তিনি সকল ঐশগুণের মূর্ত বিগ্রহ। অবতার-শরীরে ভগবানই নানাভাবে খেলা করেন। তবে জগতের বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্যে তিনি অল্পসংখ্যক শুদ্ধচিত্ত ভক্ত ও অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছেই নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন। আর ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন বলে সাধারণ লোকে তাঁকে ধরতে চিনতে পারে না, এমন কি অবজ্ঞাও করে।

৩১৪। পুরুষকার ও ভগবৎকৃপার কি করে সামঞ্জস্য হতে পারে? এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ বলেই মনে হয়, কিন্তু তা নয়। পুরুষকারও পরমেশ্বরের দান, তাঁর

কৃপা। পৌরুষহীন ভক্ত নিম্নশ্রেণীর। দেখ মহাবীর, অর্জুন, প্রহ্লাদ কেমন বীর ভক্ত! হনুমান সমুদ্র পার হতে ভয় পান নি, 'জয় রাম' বলে এক লাফে পার হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ বার বার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও কিছুমাত্র বিচলিত হন নি, তন্ময় হয়ে বিষ্ণুর শরণ নিয়েছিলেন। তাই তিনিও আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। অর্জুনের বীরত্ব সর্বজনবিদিত। পুরাণে আরও কত দৃষ্টান্ত আছে।

৩১৫। বীর ভক্ত বলে, আমি মায়ের সন্তান হয়ে, ঈশ্বরের দাস হয়ে কিসের ভয় করবো? আমার অসাধ্য কি আছে? বীর ভক্ত বলে :-

"এ সংসারে কারে ডরি, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
* * *
আমি ভক্তিজোরে কিন্‌তে পারি
ব্রহ্মময়ীর জমিন্‌দারী।"
"আয় মা সাধনসমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
এ মা দেখবো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন।
আমার রসনা ঝংকারে, কালীনাম হুংকারে,
কার সাধ্য এসে রণে র'ন॥
* * *
দ্বিজ রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনিব তোমায় সমরে॥"

ঠাকুর একেই বলতেন "ডাকাতে ভক্তি" – মার্ মার্ করে পড়ে মায়ের রত্নভাণ্ডার লুঠ করা।

৩১৬। যার পৌরুষ আছে তার প্রতি ভগবান সদয় হন, তাকে সাহায্য করেন। সাহস, উৎসাহ ও উদ্যমহীন ভক্ত মেদামারা তামসিক স্বভাব। তারা ভাবে, ভগবানের নাম সকাল সন্ধ্যা নিলুম, কিছু তো আনন্দ পেলুম, তাঁর যখন দয়া হবার তখন হবে, যা কিছু পেলুম তাই যথেষ্ট। এদের বহু জন্মান্তে ভগবানকে পাবার জন্যে ব্যকুলতা আসে। এরা সিঁদেল চোর – ভয়ে মরে, সামান্য কিছু পেলেই সন্তুষ্ট। তবুও পাকা চোর হওয়া চাই, জাগা ঘরে চুরি কিনা।

৩১৭। দীন-হীন ভাব স্বামীজী দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন, "ও নাস্তিকতা, ওগুলো ব্যারাম। নেই নেই করলে তাই হয়ে যায়। ও কি দীনতা, না গুপ্ত অহংকার? আমি পাপী, আমি অতি অপদার্থ দুর্বল – এই রকম ভাবতে ভাবতে আরো তাই হয়ে যায়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' যাদের শরীর মন দুর্বল তাদের ধর্ম হয় না। তাদের দ্বারা কোন কাজই হয় না। ও লক্ষ্মীছাড়া ভাবগুলোকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করে দেবে। বরং বল, অস্তি অস্তি – আমার ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে। যে আপনাকে সিংহ ভাবে সে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।' সিংহ যেমন পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি যে জগৎরূপ জাল ছিঁড়ে মুক্তিলাভ করে। বীর হতে হবে, 'অভীঃ অভীঃ' ভয়শূন্য হতে হবে – ধর্মই কর, আর সংসারই কর। নইলে তুমি 'যে তিমিরে সে তিমিরে' চিরকাল পড়ে থাকবে।"

৩১৮। নিজের ও পরের কল্যানের জন্যে যা কিছু করা হয় তাই ধর্ম। বাকি সব অধর্ম।

৩১৯। যাদের অন্তরে আত্মোপলব্ধির জন্যে অভাববোধ হয়নি, যাদের মুক্তিলাভের পিপাসা জাগেনি, তাদের হাজার উপদেশ দাও, সব বৃথা। তারা এ কান দিয়ে শোনে ও কান দিয়ে বার করে দেয়। আমাদের দেশে মূর্খ চাষাভূষোরাও দার্শনিক! তারা পাশ্চাত্ত্যের অনেক বিদ্বানের চেয়ে বেশি বোঝে! ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', এ কথা তো ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। জমি তৈরি না হলে ও সময় মত ভাল বীজ না পড়লে কি আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হয়? যাদের বিষয়রস শুকিয়ে এসেছে তাদের অনুরাগ, খড়ের গাদায় আগুনের এক ফিনৃকি পড়ার মতো একটুতেই ধু ধু করে জ্বলে উঠে। লালাবাবু ধোপার একটা কথা – 'বাসনায় আগুন দে' – শুনেই বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। বেশ্যার তিরস্কার শুনে বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সংসারত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রেমের ভিখারী হয়েছিলেন। তাঁরা বৃন্দাবনে কি আশ্চর্য ও কঠোর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন! এই জন্মেই যাদের হবার হয়, তাদের এমনি করেই হয়।

৩২০। মনেপ্রাণে সরল হতে হবে। যার সরলতা আছে তার সাত খুন মাপ। সে হাজার পাপী হয়েও সময়ে ভগবানের কৃপা লাভ করে পরম ভক্ত হয়ে যায়।

৩২১। মানব জমিন অনুর্বর নয়, চাষ-যত্ন অভাবে

আগাছা, বনজঙ্গলে ভরে গেছে, সাপ-বিছের আবাস হয়েছে, তাই সর্বদাই ভয় লেগে থাকে। এই মানব-জমিন যত্ন করে চাষ করলে – গুরুদত্ত সাধনভজন নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করলে – অমূল্য ধন প্রসব করবে – সুখ, শান্তি, আনন্দের খনি হবে। সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন :-

"মন রে কৃষি কাজ জান না –
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

৩২২। জগতে জড় বলে কোন বস্তুই নেই। যাকে আমরা জড় বলি তার চেতনা তমসাবৃত মাত্র। সেই তম আবরণ সরিয়ে নিলে দেখবে মায়ার অন্ধকার দূর হবে, চৈতন্যশক্তির প্রকাশ হবে, জগৎ চৈতন্যময় জ্ঞান হবে, আনন্দ-উৎস উথলে উঠবে।

৩২৩। জগতে কোন কাজ, কোন চিন্তা, কোন শক্তি বৃথা নষ্ট হয় না। কোন না কোন সময়ে অচিন্তিতভাবে উহা তোমার বা অপরের এই বা পরজীবনে সদসৎ ভাব অনুযায়ী ফলবেই, কার্যকর হবেই, সুখ বা দুঃখ ভোগরূপে। সাধু সাবধান! নিজের শ্রেয় অভিলাষী হও তো সৎপথ অনুসরণ ও অসৎপথ বর্জন করবে।

৩২৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী শক্তি উপাসকদের পরম পবিত্র গ্রন্থ। উহা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ তিথিতে, দুরারোগ্য ব্যাধি বা আপদ-বিপদ হতে মুক্তি কামনায় শান্তি-স্বস্ত্যয়নে, অথবা দেবীপূজার অঙ্গরূপে যথাবিধি সংযম করে আবৃত্তি করা হয়। স্বামীজী বলতেন, পরমেশ্বরের স্বরূপ দেবীভাবে চণ্ডীতে যেরূপ কল্পনা করা হয়েছে, সেরূপ পূর্ণ ও সর্বব্যাপক ভাবে তাঁর চিন্তা ও উপাসনা আর কোনও ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় না। তা ছাড়াও চণ্ডী হতে আমাদের শিক্ষণীয় ও পালনীয় বহু বিষয় আছে। তন্মধ্যে একটি যেমন স্ত্রীলোককে জগন্মাতার অংশ জ্ঞানে মাতৃভাবে দর্শন ও পূজা করা, যা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা অপূর্বভাবে দেখতে পাই।

৩২৫। চণ্ডীতে আছে, দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের সমবেত তেজ হতে চণ্ডিকা উদ্ভূত হন, এবং এই মূর্তিমতী সংহতি শক্তির নিকট বিরাট দানব শক্তির পরাজয় ঘটে। দেবীপূজা প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাবে সংহতি শক্তির আরাধনা।

আমরা যদি দেশের ও দশের কল্যাণসাধনে পরস্পরের মধ্যে ভেদ ও স্ব স্ব স্বার্থ ভুলে গিয়ে একাট্টা হয়ে, একজনকে নায়ক করে একমতে কাজ করি, তাহলে কোনও বিরুদ্ধ শক্তি যত বড় প্রতাপশালীই হোক না কেন, আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না বা আবাদের পরাভূত করতে পারবে না। আমরা সর্বত্র জয়লাভ করবো।

৩২৬। আমরা হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ নই, সেইজন্য আমরা এত দুর্বল, এত অসহায় হয়ে পড়েছি। তাই আমাদের ওপর নানা অত্যাচার হয় এবং আমাদের নীরবে সহ্য করতে হয় ও অহিংসার দোহাই দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই, বস্তুতঃ প্রবঞ্চনা করি। একেই মহাত্মা গান্ধী non-violence of the weak (দুর্বলের অহিংসাব্রত পালন) বলে দোষারোপ করেছেন, এবং non-violence of the strong অর্থাৎ নির্যাতন প্রতিশোধের পূর্ণ শক্তিসামর্থ্য সত্ত্বেও বৈরীর প্রতি অহিংসাভাব পোষণ ও সপ্রেম ব্যব্যহারকে অহিংসা ধর্ম পালন বলেছেন। স্বামীজীরও ইহাই মত ছিল। অন্যায় বা অত্যাচার প্রতিরোধ কল্পে তুমি যদি এক গালে চড় খেয়ে আততায়ীর দুগালে চড় মারতে না পার, সে তোমায় হত্যা করতে উদ্যত দেখে তুমি যদি তাকে নিপাত না কর, তাহলে তুমি আবার কিসের মানুষ। হিন্দুশাস্ত্রেরও এই মত।

৩২৭। স্বামীজীর অমরনাথ যাত্রার মুখে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মশাই, বলবানকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে দেখলে আমাদের কি করা উচিত?" স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন এর আর কথা কি? অবশ্যই ঐ বলবানকে ধরে আচ্ছা করে মার লাগাবে।"

ঐরকম আর এক সময়ে স্বামীজী বলেছিলেন, "দুর্বল ও নিশ্চেষ্ট বলে কিল খেয়ে কিল চুরি করা যদি ক্ষমা হয় তা কোন কাজেরই নয়। তার চেয়ে বরং লড়ে যাওয়া ভাল। হাজার হাজার দেবদূতকে পর্যন্ত সহজে জয় করবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে তবেই তোমার ক্ষমা করার অধিকার – "গৃহস্থের পক্ষে আত্মরক্ষা।"

৩২৮। তাই হিন্দুদের বাঁচতে হলে বলসঞ্চয়ই একমাত্র কর্তব্য। তার প্রধান উপায় হচ্ছে একতা। আমাদের ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হলে, ধর্মের জন্যে প্রাণ

দিতে কুণ্ঠিত না হলে, কেউই আমাদের ধর্মের নিন্দা ও দেবতা বা দেবস্থানের অবমাননা করতে সাহসী হত না। বিধর্মী বদমায়েশরাও আমাদের স্ত্রীজাতির উপর অমানুষিক ও ঘৃণিত অত্যাচার করতে সাহসী হত না। সকলের একত্র ও একমত হওয়া ছাড়া হিন্দুর বাঁচবার উপায় নেই। ধর্মের, সমাজের, কৃষ্টির ও আপনাদের রক্ষার জন্যে নিজেদের মধ্যে শ্রেণী-বিভেদ, নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ ও দ্বেষাদ্বেষী ভুলে গিয়ে একত্র হতে পারলে বিধর্মীরা আমাদের ধর্ম-ব্যবস্থার কুৎসারটনা বা বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পাবে।

৩২৯। বরাহনগর মঠে স্বামীজী গুরুভাইদের একটি গল্প বলেছিলেন; এক জমিদারের বাগানে দুটি মালী ছিল। একজন প্রায় সব সময় করজোড়ে তাঁর সুমুখে বসে থাকতো ও ভক্তি গদ্‌গদভাবে বলতো, "আহা! প্রভুর কিবে চোখ, কিবে নাক, কিবে রূপ!" ইত্যাদি। অপর মালীটি সমস্ত দিন বাগানে খেটে নানা রকম শাক-সবজি, ফল-ফুল উৎপন্ন করতো ও সেই সব রোজ মালিকের সামনে রেখে প্রণাম করে চলে যেত। মালিক কার উপর বেশী সন্তুষ্ট? ভগবানও তেমনি যে নিজের কর্তব্য কর্ম অবহেলা করে কেবল স্তব-স্তুতির দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে চায়, তার চেয়ে যে তাঁর সেবাজ্ঞানে নিজের কর্তব্য কাজ দেহমন লাগিয়ে সম্পন্ন করে তার উপরই বেশী সন্তুষ্ট হন। স্বামীজী গুরুভাইদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "দেখিস, তোরা যেন 'কিবে চোখ। কিবে নাকের' দলে বা ঘন্টানাড়ার দলে পড়িসনি।"

৩৩০। ধর্মলাভ মানে আত্মানুভূতি। যার তা হয়েছে সেই যথার্থ ধার্মিক। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা সকলেই নাস্তিক। আমরা যদি ভগবানকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করতে পারি, সর্বব্যাপী (omnipresent) বলে ধারণা করি, তা হলে তাঁর সাক্ষাতে কি কুকাজ করতে পারি? আমরা যদি বিশ্বাস করি যে আমরা যা অন্তরে চিন্তা করছি তিনি সব জানতে পারছেন, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ (omniscient) তা হলে কি আমরা লজ্জায় অসৎ চিন্তা হতে বিমুখ হতুম না? আমরা যদি জানি যে আমাদের পাপ কাজের ফলে তিনি শাস্তি-স্বরূপ আমাদের নরকযন্ত্রণা বিধান করতে সমর্থ, কেন না তিনি সর্বশক্তিমান্ (omnipotent), তা হলে কি আমরা তাঁর ভয়ে পাপ হতে বিরত হতুম না? আমরা লোক-লজ্জা, অপবাদ বা শাস্তির ভয়ে বাহ্যতঃ সৎ হতে চেষ্টা করি, আসলে নয়। বাহিরে ধার্মিক সেজে যাতে ধরা না পড়ি এমন লুকোচুরি করে গুপ্তভাবে অসৎ কাজ করতে ছাড়ি না। এরকম স্বভাবের লোকদের চেয়ে বরং যারা নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়, তারা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

৩৩১। স্বামীজী বলেছেন, যখনই পার, যেমন পার অপরকে সাহায্য করবে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে করছো সে দিকে নজর রাখবে না। যদি তুমি নিজের কোন সুবিধা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কর তো জানবে যে, তাতে যাদের সাহায্য করছো তাদের বিশেষ কিছু লাভ বা উপকার হবে না, তোমারও নয়। কিন্তু উহা যদি নিঃস্বার্থ হয়, তাহলে যাদের দিচ্ছ তাদের তো প্রভূত সুখ ও কল্যাণ হবেই, পরন্তু তার সহস্রগুণ সুখ ও কল্যাণ তোমার নিজের হবে। তোমার বেঁচে থাকাটা যেমন সত্য, এও ঠিক তেমনি ধ্রুব সত্য।

৩৩২। পূজা দুই প্রকার – বাহ্য ও মানস। বাহ্যিক পূজায় দেবতার মূর্তি, পট, ঘট, দারু ও শিলা প্রভৃতিতে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। আমরা মানুষ; মানুষের জীবনধারণের জন্যে যা যা দরকার এবং মানুষ যাতে সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দ পায়, দেবতার পূজায় সেই সব জিনিস তাঁকে নিবেদন করা হয়; যেমন, – পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, আসন, বসন, ভূষণ, ফুলের মালা, গহনা ইত্যাদি; গন্ধপুষ্প, চন্দন, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফলমূল, মিষ্টান্ন, পায়েস বা অন্ন ও পুরি-ব্যঞ্জনাদি ভোগ, পানীয় জল, তাম্বুল, শয্যা, ব্যজন, স্তোত্রপাঠ, গীতবাদ্য, নৃত্য, আরতি ইত্যাদি। কোন উপকরণ না থাকলে ভক্তিভরে ঐ সকলের অনুকল্পে কেবল জল দিয়েও পূজা করা যায়।

৩৩৩। মানস পূজায় দেববিগ্রহের বা কোন উপকরণের দরকার হয় না। দেবতার মূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করে মনে মনে উপরোক্ত দ্রব্যাদি কল্পনা করে তাঁকে নিবেদন করলেই মানস পূজা করা হল। এ পূজায় ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, অস্পৃশ্য সকলেরই অধিকার আছে। এ পূজায় শুচি-অশুচি, দেশ-কাল, বাধা-নিষেধের কোন বালাই নেই; কেবল মনঃসংযোগের দরকার।

৩৩৪। অন্ন বা ভোজ্যমাত্রই জীবগণের সাধারণ সম্পত্তি, ইহা উপনিষদের শিক্ষা। পরপীড়ন বা অপরকে বঞ্চিত না করে একগ্রাস অন্নও কেহ মুখে তুলতে পারে না। দেবতাকে অন্ন নিবেদন না করে ও ক্ষুধার্ত অতিথি ও পশুপক্ষীদের ভাগ না রেখে যারা অন্ন (ভোজ্য)নিজেদের জন্য রেঁধে খায়, তাদের আমাদের শাস্ত্র পাপী, ও সে অন্নকে পাপ অন্ন বলেছে। গৃহী ব্যক্তি ক্ষুধিতকে অন্ন না দিয়ে নিজে ভোজন করলে শাস্ত্রে নরক ভোগের ব্যব্যস্থা আছে। (বৃহদারণ্যক, ১ম অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ, ২য় শ্লোক)। তবে অসমর্থ পক্ষে যথাসাধ্য করণীয়।

৩৩৫। নিজের ও আত্মীয়স্বজনদের সুখ ও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে যা কিছু করা যায় তা সাংসারিক ব্যাপার মাত্র, ধর্ম নয়। নিজের স্ত্রীপুত্র স্বজনকে ভালবাসার নাম মায়া, সংসার; সর্বজীবে ভালবাসার নাম প্রেম, দয়া। সেইরূপ যা কিছু পুণ্যকর্ম, তপস্যা, পূজা বা সাধনভজন নিজের ইহকাল বা পরকালের সুখ ও কল্যানের জন্যে করা হয় তা স্বার্থপরতা, আর সেই হিসাবে উহা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা নয়। কিন্তু যখনই ওই সব কর্ম ফলভোগের ইচ্ছারহিত হয়ে সর্বজীবের সুখ ও কল্যানসাধনে অনুষ্ঠিত হয় – তারা সকলেই সমভাবে উহার অংশীদার হোক এই মনোভাব নিয়ে করা হয়, তখনই উহা সহস্রগুণ ফলপ্রসু হয় – নিজের ও অপরের পক্ষে। করুণাবতার বুদ্ধদেব বলেছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত জগতের সমস্ত জীব মুক্তিলাভ না করে ততদিন আমি মুক্তি চাই না।" কত উচ্চদরের আদর্শ!

৩৩৬। কিন্তু পরের কল্যানের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করে সহস্রগুণ ফল লাভের আশা যদি পোষণ কর, তা হলে আর নিষ্কাম কর্ম হল না। সে তো সেই একগুণ কাজ করে হাজারগুণ ফল কামনা করা হল – যেমন লোকে দশ টাকার নোটকে একশ টাকার নোটে আথবা এক ভরি সোনাকে একশ ভরিতে পরিণত করার প্রলোভনে ধূর্ত জুয়াচোরদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের প্রদত্ত মূলধন বা স্বর্ণমুদ্রা ও গহনাদি খোয়ায়।

৩৩৭। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন সর্বধর্মসন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তেমনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম এই সাধন প্রণালী চতুষ্টয়ের সমবায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনের ইহাই একমাত্র উপায়। তাঁরই জীবনালোকে উদ্ভাসিত হয়ে স্বামীজী এই সকল যোগের সমবেত সাধনতত্ত্ব সাধারণে প্রচার করেছিলেন ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মিশনের সাধনপ্রনালী ও উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর উদ্ভাবিত মঠ ও মিশনের emblem (সীলমোহর)-এ ইহাই পরিব্যক্ত হয়েছে। উহার প্রতিকৃতি তাঁর কৃত ব্যখ্যাসহ নীচে উদ্ধৃত হল।

৩৩৮। "চিত্রের তরঙ্গায়িত সলিলরাশি কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্প-পরিবেষ্টনটি যোগ এ বং জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শনলাভ হয়। চিত্রের ইহাই অর্থ।"

৩৩৯। আত্মজ্ঞান মানে কেবল আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে অনুভূতি করা নয়; সকল জীবকেও ব্রহ্মরূপে দেখা। অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন উপনিষদের মতে পরম আত্মানুভূতির বা মুক্তির লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা এর প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাই। এই জীবব্রহ্মবাদ এতকাল শাস্ত্রে দার্শনিকদের পাণ্ডিত্যের বিচারে নিবদ্ধ ছিল, এ বং পর্বত-অরণ্যবাসী যোগী ঋষি ও কতিপয় মুমুক্ষুর সাধনার বস্তু হওয়ায় গিরিগুহায় লুক্কায়িত ছিল। এই মহান্ তত্ত্ব কিভাবে গৃহী সন্ন্যাসী নির্বিশেষে সকলের দৈনন্দিন জীবনে কার্যকর করা যায় তার ইঙ্গিত স্বামীজী ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়ে জীবকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবাব্রত জগতে প্রচার করেছেন। "আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" – নিজের মুক্তি ও জগতের হিতের জন্যে – এই আদর্শ যে পরস্পরের পরিপন্থী নয়, পরন্তু সাহায্যকারী, – কিরূপে সাধনার দ্বারা বেদান্তের জীবব্রহ্ম-বাদকে প্রত্যক্ষ অনুভব করতে এ বং মানুষের সেবায় ইহাকে প্রয়োগ করতে পারা যায়, তার কৌশল বা পন্থা। জগৎকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৩৪০। স্বামীজীর প্রবর্তিত এই নরনারায়ণ সেবাধর্ম একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। ইহা বৌদ্ধযুগের ভিক্ষুদের বা মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের অনুষ্ঠিত সেবাধর্ম হতে মূলতঃ বিভিন্ন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যে আর্ত নরনারীগণের করতেন তা

দয়া বা করুণা প্রণোদিত ও তাঁদের নির্বাণলাভের সহায়ক হিসাবে। ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের সেবাকার্যও দয়া বা করুণামূলক। এই ধরনের সেবাকার্যে সেবা ও সেবকের মধ্যে ভেদবুদ্ধি অপরিহার্য। এতে সেবকরা নিজেদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করেন ও সেব্যরা তাঁদের সাহায্য ভিখারী বলে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এই ভাব পোষণ করেন। কিন্তু উপনিষদের অদ্বৈতভাবমূলক বলে স্বামীজীর প্রবর্তিত "আর্তনারায়ণ দরিদ্রনারায়ণ সেবা"য় সেব্য-সেবকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ উভয়েই আত্মার দিক দিয়ে অভিন্ন; পরন্তু সেব্যরা সেবকদের সেবার বা পূজার সুযোগ, সৌভাগ্য ও অধিকার দিচ্ছে বলে সেবকরা আপ্যায়িত ও সেব্যদের কাছে কৃতজ্ঞ। স্বামীজী বলেছেন, "Let the giver kneel down and worship, let the receiver stand up and permit!" অর্থাৎ দাতারাই গ্রহিতাদের সামনে হাঁটু পেতে তাদের সেবা বা পূজা নেবার জন্যে করজোড়ে প্রার্থনা জানাবে ও অনুমতি ভিক্ষা করবে। পূর্বোক্তদের ভাবের সঙ্গে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

৩৪১। জড় প্রতিমায়, ঘটে, পটে, কাঠে বা শিলায় যদি উপাস্য দেব বা দেবীকে আহ্বান করে অন্তরাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপে পূজা করা যায়, তাহলে জীবে, বিশেষতঃ জীবশ্রেষ্ঠ জীবন্ত মানুষে এইরূপ পূজা করা যাবে না কেন? মানুষের পূজা মানে তার স্থূলদেহের পূজা নয়, তার মধ্যে যে আত্মরূপী নারায়ণ রয়েছেন, তাঁরই পূজা। যে আত্মরূপী নারায়ণ আমার মধ্যে আছেন তিনিই সকল নরনারীর দেহে রয়েছেন, এই অভেদ দৃষ্টিতে অজ্ঞ দরিদ্র রুগ্ন রূপধারী নারায়ণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদান, অন্নবস্ত্রদান, ঔষধদান ও সেবাশুশ্রূষাদি এই পূজার অঙ্গ। অন্যান্য দেবদেবীর পূজার ন্যায় এ পূজাতেও আত্মার সহিত অভিন্নভাব না থাকলে ইহাও পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। শাস্ত্রও বলে "শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ" – শিব হয়ে শিবের পূজা করবে; "দেবো ভূত্মা দেবং যজেত," – দেব হয়ে দেবতার পূজা করবে।

৩৪২। স্বামিজীর প্রবর্তিত এই নর-নারায়ণ উপাসনা চিত্তশুদ্ধির জন্যে নিষ্কাম অনাসক্ত পরার্থ কর্ম-মাত্র নয়, পরন্তু জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সামঞ্জস্যে সমন্বিত পরমাত্মার উপাসনার এম সম্পূর্ণ নূতন সাধন পদ্ধতি। কেন না ইহা জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের সমবায়ে পরমাত্মার উপাসনা বলে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ। ইহাতে জ্ঞানযোগ সহায়ে মানুষকে আত্মরূপী নারায়ণ বলে জানতে, রাজযোগ সহায়ে আত্মরূপী ঈশ্বরের প্রণিধান করতে, ভক্তিযোগে সহায়ে তাঁর প্রতি পরম অনুরক্ত হতে এ বং নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম সহায়ে তাঁর সেবা করতে হয়।

৩৪৩। কেবল মুক্তিলাভের দিক দিয়ে নয়, স্বামীজীর এই নর-নারায়ণবাদ মানুষকে মানুষের কাছে সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করার ফলে এ র মহত্ত্ব অসাধারণ; কারণ এ মতে মানুষ দীন হীন কৃপার পাত্র নয়, পরন্তু পরম শ্রদ্ধার পাত্র – শিব। অধিকাংশ ধর্মযাজক ও পুরোহিত ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে মানুষের পুণ্যের ও পাপের কঠোর দণ্ডদাতা বিচারক রূপে আকাশের বহু ঊর্ধ্বে স্বর্গে রত্নসিংহাসনে বসিয়ে, মানুষ চিরপাপী বলে তার অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করেছেন। আর স্বর্গের চাবি পুরোহিতদের কাছে থাকায় তাঁদের বিষয় সম্পত্তি ও অর্থাদি দানে পরিতুষ্ট করলে পাপিতাপীরা তথায় প্রবেশাধিকার পাবে, ইহা ধর্মের শাসনবলে প্রতিপন্ন করে তাদের শোষন করেছেন।

৩৪৪। এই মারাত্মক মতের বিরুদ্ধে স্বামীজী চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "হে অমৃতের সন্তানগণ, কে বলে তোমরা পাপী, তোমাদের পাপী বলাও মহাপাপ! তোমরা যে অমৃতত্বের অধিকারী! সেই পরম পুরুষকে জ্ঞাত হয়ে তোমরা জন্মমৃত্যুর পারে চলে যাও, মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নেই।" কি অমৃতময় আশার বাণী! তথাকথিত দীনহীন অবজ্ঞের অসহায় ও অস্পৃশ্য নরনারীগণ আত্মরূপে সাক্ষাৎ শিব এবং আমাদের সেবা ও পূজা পাবার যোগ্য, এই মহাবাণী জোরের সহিত প্রথম প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এ বং তাঁর উদ্যোতক হচ্ছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

৩৪৫। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে সারা বিশ্বে মানুষ অন্য মানুষকে, এক জাতি অন্য জাতিকে স্ব স্ব ভোগস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে নির্মম ভাবে ধ্বংস করছে। এ যুগে মানুষের হাতে মানুষকে লাঞ্ছনা – মানবতার অবমাননা, মানুষের প্রতি মানুষের হীনদৃষ্টি এবং প্রভুত্ব ও অপমানসূচক ব্যবহার চরমে উঠেছে। মানুসের প্রতি জিঘাংসায় মানুষ বন্য হিংস্র জন্তুকেও অতিক্রম করেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শক্তিমান্

তথাকথিত উন্নত জাতিরা তাদের জাতীয় উন্নতি ও স্বদেশ সেবার পুণ্যনামে এবং জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সভ্যতা বিস্তারের দোহাই দিয়ে দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির সর্বস্ব শোষণ করে সর্বনাশ সাধন করছে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে অপাশ্চাত্য অশ্বেত অখ্রীষ্টান মানুষ নয় – অসভ্য বর্বর! তাঁদের ভোগসামগ্রী উৎপাদনের যন্ত্ররূপে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। এইরূপ পীড়দায়ক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বের ভোগের উপকরণ রাশি নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আধুনিক প্রলয়ান্তক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মূল কারণ।

৩৪৬। ভারতবর্ষেও ধর্ম, সমাজ, সম্প্রদায় ও অধিকারবাদের নামে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিদ্বেষমূলক নানারকম ভেদ, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করছে ও জাতীয় জীবনকে সর্ববিধ দুঃখ দৈন্য ও দুর্দশায় জর্জরিত করে রেখেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কি পাশ্চাত্যে, কি প্রাচ্যে মানুষ বা জাতির প্রতি উপরোক্ত জঘন্য দৃষ্টি ও ভাব পোষণ ও সেই অনুযায়ী আসুরিক ব্যবহার জগতে সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষের মূল কারণ, এবং স্বামীজীর প্রবর্তিত নারায়ণ-জ্ঞানে জীব সেবাই এই বিষম সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এই চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শন সাধনাত্মক আদর্শে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রমুখ মানবজীবনের সকল বিভাগ – এমন কি মানুষের দৈনন্দিন জীবন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করতে উপদেশ দিয়েছেন। এই মহান্ আদর্শ জগতে প্রচার করাই এ বং কার্যে পরিণত করবার নির্দেশ দানই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য।

৩৪৭। ভগবান একাধারে নৈসর্গিক নিয়ম ও প্রেমস্বরূপ। জগন্মাতারূপে প্রেমস্বরূপিণী ও দয়াময়ী, জগৎপিতা রূপে ন্যায়বিধাতা। তিনি কর্মফলদাতা, আবার কপালমোচনরূপে শরণাগত ভক্তগণকে সকল পাশ হতে তিনি মুক্ত করেন।

৩৪৮। যেমন বায়ু মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় এমন ঘনীভূত করে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, সূর্যকে ঢেকে ফেলে – আবার বায়ুই মেঘকে উড়িয়ে দেয়, মেঘ সরে গেলে সূর্য প্রকাশিত হয়, – তেমনি মনই বন্ধনের সৃষ্টি করে, মনই বন্ধনকে দূর করে। জীবের অন্তর হতে মায়া নাশ হলে পরমাত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশ পান। মায়া একটা উড়ো ক্ষণিক আভাসমাত্র; তার কি ক্ষমতা যে পরমাত্মাকে বিকাশ করে, যা নিত্য সত্য স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ!

৩৪৯। স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ভাব ও সার্জনীন ধর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ রূপে শুধু যে জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে তা নয়, সেগুলিকে জীবনে কার্যকর করতে হবে। আর্থাৎ হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের জীবে দয়া, খ্রীষ্টানদের কর্মতৎপরতা, ইস্‌লামের পরস্পরের মধ্যে ভাতৃভাব আমাদের জীবনে দৈনন্দিন কাজের দ্বারা প্রতিফলিত করতে হবে। সেই জন্যে আমাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩৫০। স্বামীজী বলেছেন, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের জন্মদাতা, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের জন্মদাতা, খ্রীষ্টধর্ম ইস্‌লাম ধর্মের জন্মদাতা। এই চার ধর্মই ভারতে পরস্পরে মিলিত হয়ে বর্তমান যুগে এক হতেই হবে। এই জন্যেই ঠসাকুর এসেছিলেন – বুড়ির সঙ্গে নাতি-পুতিদের ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ধরায় শান্তিস্থাপনের জন্যে।

৩৫১। সারা জীবনে উপদেশ তো অনেক শুনেছ, পেয়েছ। উপদেশ তো অনেক জান, অনেককে দিয়েও থাক। কিন্তু তোমার কথা শুনবে কে, যদি তুমি তার খানিকটা অন্ততঃ নিজে করে না দেখাতে পার। কথায় ও কাজে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মেলা উপদেশ পড়বার বা শোনবার দরকার হয় না। মুক্তিপথের একটা উপদেশও যদি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে পার তা হলে তুমি ধন্য হবে, জগতের কল্যাণ হবে। আর তুমি মার কৃপায় দুস্তর ভবসাগর পার হয়ে আনন্দ ধামে প্রয়াণ করবে।

৩৫২। আমরা ভাই, মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার সময় নগ্ন ও একা এসেছিলুম। ধরাধাম হতে যখন বিদায় নেব তখনও আমাদের একা একাই চলে যেতে হবে। কেউই আমাদের সঙ্গে যাবে না – এমন কি যারা আমাদের প্রিয়তম জন – এক মুহূর্তও যারা আমাদের ছাড়া থাকতে পারে না এবং আমরাও যাদের তিলমাত্র অদর্শন সহ্য করতে পারি না, তারাও নয়। প্রাণ হতে প্রিয় আমাদের আকর্ষণের বস্তু যে ধনসামগ্রী, তাও কিছু আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। নবজাত শিশু যে কেঁদে ওঠে তা তার

জীবনের পরিচায়ক – ঐ কান্নার শব্দ অপরের আনন্দদায়ক হয়। তোমার দেহত্যাগ করবার সময় অপরে তোমার জন্যে কাঁদবে; কাঁদুক, তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির শান্তভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিও। সে সময় তোমার মুখে যেন স্ফুরণ হয় সেই অপার্থিব আনন্দ ও প্রশান্তি যা তোমার অতলান্ত সত্তায় সদা বিরাজমান। তবেই তো তোমার যথার্থভাবে জীবনযাপন সার্থক হয়েছে। সে ক্ষেত্রে জীবনের উপর কোন মোহ বা মরণের প্রতি কোন ভীতি তোমার থাকবে না। জীবন ও মৃত্যু দুটোকেই তুমি জয় করে উভয়েরই পারে এমন এক নতুন দ্বন্দ্বাতীত রাজ্যে চলে যাবে – যেখানে বন্ধন বা মুক্তি নেই, ভাল বা মন্দ নেই, সুখ বা দুঃখ নেই, আলোক বা অন্ধকার নেই – যা এসকল হতে দূরে, অতি দূরে! সে অবস্থায় শুধু নিজে নিজেকে জানা – নিজে তুমি স্বরূপতঃ যা তাই জানা – স্বাত্মোপলব্ধি। সে অবস্থা অক্ষয় অনন্ত শান্তির অবস্থা – ভূমা অস্তিত্ব, জ্ঞান এ বং আনন্দের অবস্থা। জীবনের সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছুবার আকাঙ্খা যদি পোষন কর তাহলে সমস্ত মায়াকে ঝেড়ে ফেলে দাও, অসৎ বস্তুর ওপর সমস্ত আসক্তি দূর করে দাও – সিদ্ধ, সত্যদ্রষ্টা আচার্য্যগণের শিক্ষা অনুসরণ তাঁদের ভাবে তদ্‌গত হয়ে যাও! তোমার ইষ্টের মূর্তিমান প্রতিনিধি এইরূপ সদ্‌গুরুর সহায়তা পেলে লক্ষ্যে পৌঁছুনো সহজ হবে। ভগবানই একমাত্র সত্য – অন্য যা কিছু সব মিথ্যা – তৎ ত্বম্ অসি – তুমিই তিনি। ইহাই হচ্ছে সার সত্য – সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মূল শিক্ষা। প্রকৃতির নিয়ম আনুযায়ী এই চরম সত্যে প্রত্যেক নরনারীকে উপনীত হতেই হবে, এই জন্মেই হোক বা অসংখ্য জন্মমৃত্যুর আবর্তনের পরেই হোক।

আমারই প্রিয়তম আত্মার স্বরূপ। তোমরা সকলে ঈশ্বর-কৃপায় সত্যকে এখনই যেন উপলব্ধি করতে সমর্থ হও এবং এই মুহূর্ত হতেই যেন অনন্ত – অনন্তকালের জন্যে মুক্ত হয়ে যাও – ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। শ্রীভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ওঁ, তোমরা শান্তিতে সমাশ্রিত হও – আমার সত্তায় শান্তি ওতপ্রোত হোক। অন্তরে এবং বাহিরে সর্বত্র, সর্বপ্রাণীতে শান্তি বিরাজমান হোক। পৃথিবী শান্তিময় হোক – অসীম অন্তরীক্ষে, সমস্ত লোকে শান্তি পরিব্যাপ্ত হোক। ওঁ ওঁ ওঁ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : www.bornosoft.com